
ভেরা পানোভা
ইভদোকিয়া



সোভিয়েত ছোট গল্প গ্রন্থমালা

ভেরা পানোভা

ইভ্‌দোকিয়া

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: **ননী ভৌমিক**

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা:
ভ্লাদিমির নস্কভ

১

কামার ইভ্‌দোকিম চের্নিশোভের দোতলা কাঠের বাড়িটি কিরভ রাস্তায় — আগেকার পের্‌ম্‌স্কায়া রাস্তা। প্রায় বছর কুড়ি আগে বাড়িটি তোলে ইভ্‌দোকিম। প্রথমে ছিল দুটি ঘর আর তিনটি জানলার একটি কুঁড়ে, পরে যোগ করা হল কোণের ঐ আলো-খেলা ঘরটা, যেখানে আন্দ্রেই তার শেষ রাতটা কাটায়, আর সামরিক বিদ্যালয়ে যাবার আগে পর্যন্ত যেখানে থাকত সাশা, আর দেয়ালে যেখানে একটা জাহাজের মডেল টাঙানো; পরে হল দোতলাটা — সংসার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, ঘরে কুলোয় না, আর পাভেল, নাতালিয়া রোজগার করতে শুরু করেছে ভালোই।

জানলায় জানলায় শাদা পর্দা, কাপড় কেটে নকসা তোলা, চের্নিশোভ পরিবারের সব মেয়েরেই হাত আছে তাতে, হাত আছে এমন কি সেই অশুভ-স্মৃতি ক্লাভদিয়ার, এ ঘরে যার

আগমনটা ক্ষণিক প্রজাপতির মতো... শাদা পর্দা আর চীনে গোলাপ। গোলাপ ফলিয়েছে কাতিয়া। ফ্রণ্টে যাবার সময় সে বহুক্ষণ ধরে ইভ্‌দোকিয়াকে বুঝিয়ে যায় কী করে পরিচর্যা করতে হবে ফুলের। মালিনী হবার কোনো বাসনা ছিল না ইভ্‌দোকিয়ার, কিন্তু কাতিয়াকে খুশি করার জন্য সে কাঁচি আর ঝারি নিয়ে জানলার ওপরকার টবের মেয়েলী বাগানটির যত্ন-আত্তি করে, সাজিয়ে তোলে।

বাড়ির ভেতরটা রুশী চুল্লির তাপে গরম, তার সঙ্গে এসে মেশে ধোয়া মেঝে আর গরম শানগা'র* সুবাস, বারান্দায় ঝোলানো কারখানার পোষাকের তেলকালির গন্ধ। অনুচ্চ কুঠরিটা বেশ পরিষ্কার, কাঠের পাটাতনের ওপর কোণাকুণি জীর্ণ চট পাতা। দেয়ালে সরু সরু ফ্রেমে বাঁধানো অনেকগুলি ফোটো। বাচ্চা লেনা ইভ্‌দোকিয়াকে জিজ্ঞেস করে:

'দিদিমা এ সব তোমার ছেলে?'

'আমারই ছেলেমেয়ে,' বলে ইভদোকিয়া।

'কতো ছেলেমেয়ে তোমার?'

'কতো আবার কোথায়: মোটে চারটি; আন্দ্রিউশা থাকলে হত পাঁচটি।'

'বা, কই চার? মেয়েই তো তোমার দশ কি কুড়ি হবে।'

---

* মাখন বা টক ক্রীমের পুর দেওয়া গোল পরোটা বিশেষ। — সম্পাঃ

'সব মিলিয়ে মাত্র দুটি মেয়ে; তোর মাসি কাতিয়া আর তোর মা।'

'আর ঐ যে বিনুনি করা চুল?'

'তোর মা।'

'আর ঐ যে ছোটো ছোটো চুল, লম্বা ঘাড়?'

'তোর মা।'

'আর ঐ যে সুন্দরীপানা, গলায় হার?'

'মা।'

'আর ঐ কামানের ওপর? ও-ও মা?' জিজ্ঞেস করে লেনা।

নিঃশ্বাস ফেলে ইভ্‌দোকিয়া:

'না, কামানের ওপর ওটি তোর মাসি কাতিয়া।'

লেনা চোখ বুঁজে বলে:

'কতো রকম তোমার ছেলেমেয়ে, আর দেখতে পারি না বাপু।'

২

১৯২২ সালে ইভ্‌দোকিম চের্নিশোভ ঠিক করল বিয়ে করবে।

মা লিখেছিল, "আইবুড়ো হয়ে আর কতো ঘুরবি। বিয়ের বয়স হয়েছে বাছা।" ততদিন পর্যন্ত বিয়ের সুযোগ হয়নি তার। জীবন তাকে ছুটিয়ে মেরেছে। ব্লিনি গ্রামের পৈত্রিক ঘুপচি কামারশালা থেকে উরাল কারখানার মস্ত কলঘরের চেঁচামেচি

ঝনঝনের মধ্যে, কারখানা থেকে যুদ্ধে। লড়াই চলে দীর্ঘকাল, সে লড়াই তাকে নিয়ে যায় উরাল থেকে কার্পাতে, কার্পাত থেকে পিটারসবুর্গে, পিটারসবুর্গ থেকে ভ্লাদিভস্তকে, হাজার হাজার কিলোমিটার রেলপথ পেরিয়ে, শত শত ময়দান, গ্রাম, স্টেশন ছাড়িয়ে, হাসপাতাল আর মরুভূমির মধ্য দিয়ে। সঙ্গী পার্টিজানদের সঙ্গে জলায় জলায় ঘোরার সময় সে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে। ঘামে ভেজা পোষাক গায়েই শুকিয়েছে, পুঁজ রসে ভরা ব্রণের চটায় ঢেকে গেছে সারা মুখ। আর হঠাৎ, অনাবৃত এক একটা ডেরায়, প্রতিরাতে তারার দিকে চেয়ে চেয়ে, ক্ষতবিক্ষত ঠোঁট ফাঁক করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করল তার ভবিষ্যৎ নীড়ের, সাংসারিক একটা স্বর্গের। পারিবারিক জীবন — সেটা একেবারে স্বর্গই মনে হল তার, ফুটফুটে একটা ঠাঁই, ভারি বুট পা থেকে খুলে রেখে যেখানে লড়াই-মেহনতের পর লোকে একটু দম নেবে। ফুটফুটে বুদ্ধিমতী একটি বৌ — তাকে সাহায্য করবে, তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেবে; ফুটফুটে আদুরে ছেলেমেয়ে...

তার মায়ের ছেলেমেয়ে ছিল এগারোটি। টেবিলে তেরোটি মানুষ যাতে না বসে সেইজন্য কুকুশ্‌তান্‌ থেকে সে নিয়ে আসে দিদিমাকে। কুকুশতান থেকে আসার ইচ্ছে ছিল না দিদিমার, কিন্তু মেয়ের কথা ভেবে মায়া হল তার — টেবিলে রোজ বসছে তেরোটি মানুষ — এ যে ভারি অলক্ষুণে ব্যাপার। কে কবে শুনেছে এমন কথা! তাই ক্লিনিতে চলে আসে সে।

হৈচৈ হাসি খুশিতে দিন কাটত। যখন পেল্‌মেনি* রান্না হত, তখন চারিদিকেই কেবল পেলমেনি—টেবিলের ওপর পেলমেনি, বেঞ্চির ওপর, খাটের ওপর, জানলার তাকের ওপর পেলমেনি, বস্তাবন্দী হয়ে বাইরের বারান্দার ঠাণ্ডায় ঝুলত পেলমেনি। টেবিলে দুধ আনা হত বালতি করে, শানগাগুলো আনা হত চাকার মতো বড় থালায়। ঠিক এমনি একটা বাড়ির কথা ভেবেছিল ইভদোকিম। তাকে সে গড়ত, সাজাত। আনত তার রোজগারের রুটি, মিঠাই। বড়ো টেবিল ঘিরে বসত সোনামণি খোকাখুকুরা, বড়ো চুল্লির চারপাশে অন্নপূর্ণা গৃহিণীর রাজ্য...

যুদ্ধ শেষের পর ইভদোকিম ফিরল উরালে, নিজের কারখানায়। অবাক হয়ে সে দেখল গোঁপে তার পাক ধরেছে, চোখের কোলে ফিকে বলি রেখা — অকালেই বইকি। কৈশোর কেটে গেছে, দেহ ওর হয়ে উঠেছে ভরাট, স্বভাবটা ভারিক্কী, আপ্রাণ পরিশ্রম করত, আজেবাজে কথা বলতে ভালোবাসত না। বৃষ্টি বাদলায় ওর জখম পাটা ব্যথা করত। ম্যালেরিয়া ওর সারিয়ে তোলা হল। রইল শুধু বাসা বাঁধার স্বপ্নটা। সেটা এখন হাসিল করা যায়। আশেপাশের মেয়েদের দিকে নজর দিলে ও, কিন্তু কাউকে মনে হল অমার্জিত, কেউ অসুন্দর — কেউবা ভালোবাসে ছোকরাদের সঙ্গে ফুর্তি লুটতে... এদের কাউকে নিয়েই বাসা বাঁধতে ইচ্ছে হল না তার।

---

* মাংসের পুর দেওয়া পুলি বিশেষ — সম্পাঃ।

'একলা খারাপ লাগে তোর চের্নিশোভ?' একদিন বললে বুড়ো আভদেয়েভ। 'সন্ধ্যেয় আসিস গল্প করা যাবে, মদ খাওয়া যাবে।'

আভদেয়েভ ছিল মাতব্বর মজুরদের একজন, মর্যাদা ছিল লোকটার। ইভদোকিম তার ভালো জামাটি গায়ে চড়িয়ে রওনা দিল।

আভদেয়েভ বিপত্নীক। পরিবেশন করল তার মেয়ে ইভদোকিয়া। বড়োসড়ো শাদা রঙের মুখ মেয়েটির, হাসি হাসি মস্ত হাঁ করা মুখ; সদাই হাসি-লেগে-থাকা এ মুখখানার চওড়া গালের হাড় আর উঁচু সরু ভুরুতে ইভদোকিমের মনে পড়ল ভ্লাদিভস্তকে দেখা সুন্দর দুর্বোধ্য এক বুদ্ধ মূর্তির কথা।

সারা সন্ধ্যে কথা বলেনি মেয়েটি, যা দেবার দিলে, এল গেল, টেবিলের ওপর ওর শাদা পুরুষ্টু হাত দুখানা শুধু নড়াচড়া করল। ইভদোকিম কথা কয়ে গেল আভদেয়েভের সঙ্গে, চেষ্টা করলে মেয়েটির দিকে না চাইতে। নামটায় ওর আশ্চর্য ঠেকল: সে ইভদোকিম, মেয়েটি ইভদোকিয়া। এ কি নির্বন্ধ? ও যখন তার পৈতৃক কামারশালায় শিক্ষানবিশি করেছে, ঢুকেছে কারখানায়, লড়েছে জার্মান ও শ্বেতদস্যুদের সঙ্গে, জলার মধ্যে প্রলাপজ্বরে বেঘোর হয়ে থেকেছে, তখন অজ্ঞাতে, গোপনে, পাতার আড়ালে কুঁড়ির মতন কেমন করে যেন ফুটে উঠেছে এই

শ্বেতবরণী মেয়েটি। আর অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, যেন হঠাৎ পথের বাঁক নিতেই দেখা মিলেছে তার। তবে কি এর জন্যই ও অপেক্ষা করে ছিল?..

সেই সন্ধ্যা থেকে কেবলি ওর কথাই ভেবেছে ইভদোকিম।

আভদেয়েভের কাছে সে যেত, কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে কথা কইত না, লজ্জা লাগত তার, চোখ তুলে চাইত না, কিন্তু ভাবত কেবলি ওর কথা। রাত্রেও মেয়েটি দেখা দিত স্বপ্নে — শুভ্রা, উষ্ণা, টানা ভ্রূধনু।

বাড়িতে অন্য কোনো মেয়ে ছিল না, ইভদোকিয়া নিজেই সব কাজ করত; সবকিছুই ভারি গোছগাছ, আর ইভদোকিয়া নিজেও সব সময় ভারি ফিটফাট, পরিষ্কার। এর জন্যই তাকে আরো বেশি ভালো লাগত ইভদোকিমের, আরো বেশি সমীহ করত। ঠিক এমনটিই তার দরকার! শুধু এই ধরনের বৌই সে চায়! কিন্তু ওর ভয় হল, মেয়েটি বোধ হয় তার ঘরে আসবে না, আভদেয়েভ তাদের বিয়েতে বাদ সাধবে। ইভদোকিম ওদের কাছে অভ্যস্ত করে নিলে নিজেকে, বিয়ের কথা পাড়ার উপযুক্ত একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় রইল।

আভদেয়েভ ওকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল। ও এল, কিন্তু আভদেয়েভ ঘরে ছিল না।

'শিগগিরই আসবে, অপেক্ষা করতে বলে গিয়েছে,' হেসে বললে ইভদোকিয়া।

বৈঠকখানা ঘরটিতে ও ঢুকল, হাঁটুর ওপর টুপিটা রেখে বসল।

সামনে তার দু'জানলার মাঝখানে দেয়ালের গায়ে একটি ছবি: পায়রাদলের মধ্যে একটি মেয়ে। সমস্ত খুঁটিনাটিতে বহুবার দেখা ছবিটির দিকেই চেয়ে রইল ইভদোকিম, কান পেতে শুনতে লাগল রান্নাঘরে ইভদোকিয়ার চলা ফেরা। কিছু পরে মেয়েটি এসে দাঁড়াল তার চেয়ারের পেছনে। ও ঘাড় ফেরাল না, পায়রাদলের মেয়েটির ছবির দিকেই চেয়ে রইল। নিথর হয়ে রইল সারা পৃথিবীটা, পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে শুধু শোনা গেল ঘড়িটার টিকটিক আর ইভদোকিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস। ভাঙা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললে মেয়েটি, ওর মাথায় হাত রেখে চাপা গলায় বললে:

'আরে মরদ...'

ও ঘুরে জড়িয়ে ধরল ওকে, টুপিটা পড়ে গেল পায়ের নিচে, দুয়ার খুলে ঢুকল বুড়ো আভদেয়েভ।

বললে, 'চমৎকার! বাপের চোখের আড়ালে... খাশা, তা যাই হোক পয়সা ওড়ায় না, বাবুগিরি করে না, মদ খায় না। বেশ, মেয়ে যা চায় তাই হোক।'

আইকনটি খসিয়ে এনে ও মেয়ে আর ইভদোকিমের সামনে দোলালে।

টেবিলে বসল সবাই, রাতের খাওয়া হল। পাত্র থেকে মদ ঢেলে আভদেয়েভ বললে:

'জীবনে সবই ঘটতে পারে। এ কথাটা তুই ভালো করে মনে রাখিস ইভদোকিম — সবই হয় জীবনে, তাতে রাগ

করতে নেই। টাকায় দের দশ মোহর, আরো বেশি দেবারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন অক্ষম।'

ইভদোকিয়া বললে:

'বাবা নিজেই বিয়ে করতে চায় কিনা।'

ইভদোকিম বললে:

'বিয়ের ভোজের আগে কিন্তু ঘর তুলতে চাই।'

'নয়ত কি,' সায় দিল আভদেয়েভ, 'ঘর তোল। সে তো ভালো কথা। মঙ্গল হোক!'

বলেই এক চুমুকে শেষ করল গেলাস।

৩

নগর সোভিয়েতের কাছ থেকে পের্‌ম্‌স্কায়া রাস্তার ওপর একটা ফাঁকা জায়গায় ঘর তোলার অনুমতি পেল ইভদোকিম। কারখানা থেকে কাঠ পাওয়া গেল আর যৌতুকের আগাম হিসেবে আভদেয়েভ দিলে পাঁচ মোহর।

ব্লিনি গ্রামে চিঠি পাঠালে ইভদোকিম, চার ভাই এল তার ঘর তুলতে। আভদেয়েভ চাইছিল তাড়াতাড়ি করে মেয়ের বিয়ে দিতে, তাহলে নিজেও সে বিয়ে করতে পারে। সেও হাত লাগালে। শস্তায় চালার টিন যোগাড় করে দিলে, দরজায় হাতল আর জানলায় ছিটকিনি বসালে। টাকার টানাটানি ছিল, প্রতিটি কোপেক হিসেব করে চলতে হত। ভাইদের তাড়া দিত

ইভদোকিম, এমন কি ছোটো ভাই সের্গেইয়ের সঙ্গে ঝগড়াও করে বসল — এটি কাজ ছেড়ে শহর চুঁড়ে বেড়াতে শুরু করেছিল।

ইভদোকিয়াকে পছন্দ হল ভাইদের।

বললে, মনটা ভালো, সংসার চালাতে পারবে।

ইভদোকিয়া ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসত, কথা কইত আপন জনের মতো করে।

এল জুন মাস। ঘর তোলা শেষ হয়ে আসছে। দিনে ইভদোকিম কাজ করত কারখানায় আর সন্ধ্যায়, শ্বেত রাত্রির দীর্ঘ বেলায় খাটত ঘর তুলতে। নিজেই ও চুল্লিটা বসালে, টবের উপর লোহার বেড় লাগালে, ঢাকনা করলে কেটলির, বানালে হাতা, লোহার মালসা, আলনার হুক। ইভদোকিয়ার জন্য বানালে ওক কাঠের দেরাজ। সব রকম কাজই ওর আসত। টিনমিস্ত্রি, চুল্লি-মিস্ত্রি, ছুতোরের কাজও করত ইচ্ছে হলে, কুড়ি ঘণ্টা একটানা খেটে যেত, ক্লান্ত হত না। কিছু একটা করতে ওর সবচেয়ে ফুর্তি লাগত যখন ইভদোকিয়া পাশে দাঁড়িয়ে দেখত।

প্রত্যেকদিনই দেখা হত ওদের, আরো যেন নিকট, আরো মিষ্টি হয়ে উঠল মেয়েটি। চলন বলন ছিল ওর ভারি নিখুঁত, ভারি ধীর স্থির; তারই মতো সব কাজই ও নিতে পারত শক্ত হাতে। ওর সবকিছুই যেন ছিল কামনাভরা, কাছে এলে বুক দুলে উঠত ইভদোকিমের!

মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য একলা পাওয়া যেত ওকে, আলিঙ্গন করত ইভদোকিম, কিন্তু ভীরু ঠোঁট ফাঁক করে ও ঠেলে সরিয়ে দিত ওকে আর অভিভূত হয়ে সগর্বে ইভদোকিম ভাবত, "সতীলক্ষ্মী সোনামণি আমার!"

অবশেষে শেষ হল ঘর তোলা।

পাতা হল আনকোরা, রঙ-না-করা টেবিল, বেঞ্চি, তাক। খাটের ওপর বিছানো হল ইভদোকিয়ার তোশক আর পর পর আটটি বালিশ। সব ওপরের বালিশটা গিয়ে ঠেকল প্রায় ছাতের সঙ্গে। পাশে রইল ঘণ্টি লাগানো পেটাই-লোহার সিন্দুক।

বিয়ের দিন এল। আভদেয়েভের বাড়িতে অ্যাকর্ডিয়ন বাজল, চলল পান ভোজন নাচ। ইভদোকিম বসে ছিল ইভদোকিয়ার পাশে। বৌয়ের মাথায় লাল ফিতে, মুখটা টকটকে। ফিতের প্রান্তটায় শুড়শুড়ি লাগছিল ঘাড়ে, আর নেশার আমেজে দুর্বল হাতে মাছি তাড়ানোর মতো করে ওটাকে সে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। ফটোগ্রাফার এল, বরকনের ছবি তুললে। সবুজ পোষাক পরা একটি রোগা মেয়ে দেখা শোনা করলে, আতিথেয়তা করলে। মেয়েটি আভদেয়েভের ভাবী স্ত্রী। 'বাবার পুরনো প্রণয়িনী,' বললে ইভদোকিয়া।

খাওয়াদাওয়া চলল সারা দিন আর গোটা রাত ধরে। রাস্তার অচেনা লোকেরা উঁকি দিয়ে দেখলে জানলায়। ইভদোকিয়াকে বাহুলগ্না করে ইভদোকিম বসে ছিল আর সবাই যখন "তেতো, তেতো" বলে চেঁচালে তখন চুমু খেল

তার ইভদোকিয়ার নরম ঠোঁটে। তার ইভদোকিয়া! এবার ওরা হাতে হাত দিয়ে যাবে নিজেদের বাড়িতে আর এতো সবে পথের শুরু, দীর্ঘ, সুখী, ন্যায্য যে পথটার শেষ হতে পারে শুধু মরণে।

তারপর উঠে দাঁড়ায় ওরা। কে যেন কী একটা বলে। রাস্তায় নামে ওরা, ভোরের আগের আবছায়া তখনো যায়নি। অতিথিরা আর রাস্তার এলোমেলো নিষ্কর্মারা এগিয়ে দেয় ওদের, অ্যাকর্ডিয়ন বাজে, কখনো যেন বা অনেক দূরে, কখনো একেবারে কানের কাছে। ওদের আগে নাচতে নাচতে চলেছে সবুজ পোষাক পরা সেই মেয়েটি। তারপর বাড়ি। ওদের ঘিরে হাসিঠাট্টা করে সবাই। কোনো কথা মাথায় ঢোকে না ইভদোকিমের — রক্তের উচ্ছ্বাসে, নেশায় কান বোঁবোঁ করে তার... ঘরে ঢোকে ওরা দুজন। দরজা বন্ধ করে দেয় ইভদোকিম।

হঠাৎ চুপচাপ লাগে সবকিছু। ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর এসে পড়েছে ভোরের ফিকে আলো, তাজা কাঠের গন্ধ উঠছে। ওরা একলা — ইভদোকিম আর ইভদোকিয়া, একসঙ্গে বাঁধা পড়েছে দুজনের ভাগ্য...

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল ইভদোকিয়া আর চিৎ হয়ে নিশ্চল পড়ে রইল ইভদোকিম, নিজেকে মনে হল তার অপমানিত, নিঃসঙ্গ।

৪

লাঞ্ছিত করে ঢিঢি পিটিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যেত... তোর ধন তুই নে... বার দুয়েক আইকন দুলিয়ে দিলে আর ভেবেছে অমনি আমি সারা জীবন ঐ ঠগ-মেয়েটার জন্য খেটে মরব আহাম্মকের মতো! সেটি হবে না। সোভিয়েত রাজত্বে জোর করে কাকেও এক সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা চলে না...

নাকি, একটা ডাহা ন্যালাখেপার মতো যে ওকে ঠকিয়েছে এটা হয়ত বা কাউকে না বলাই ভালো। কাউকে না বলে ওকে কষ্ট দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভর্ৎসনা করে মারাই ঠিক। "কী... তুই আবার আসিস কথা বলতে? তুই নষ্টা, কুলটা, ঠকিয়ে এসেছিস আমার ঘরে, নিজের পাপ ঢাকতে। নাগরটি বুঝি পালিয়েছে? পালাল কেন? ছলাকলায় ভুলল না বুঝি, বিয়ে করল না?" এমনি করে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে পাঁকাটি করে দেওয়া...

কিন্তু হায়, কী করে সে থাকবে এই সুন্দর বাড়িতে, এ বাড়ি যে সে গড়তে শুরু করেছিল সেই পচা জলায়, পার্টিজানদের চালচুলোহীন সেই জীবনেই? সেই বাড়ি যার মাথার উপরে আজ সত্যি সত্যি চালা নেমেছে।

অতো চমৎকার করে কল্পনা করে এসেছে যে জীবনের, কতো দিন থেকে স্বপ্ন দেখেছে যে জীবনের, সে জীবন সে গড়বে কাকে নিয়ে? কোথায় সে, তার ফুটফুটে বৌ?..

ও যদি বাপের ঘরে চলে যায়, ওর জন্য গড়ে তোলা এই দেয়ালগুলোর মধ্যে যদি সে একা থাকে, তাহলেই কি আর কষ্ট কমে!.. না, দুঃখে ও টিকতে পারবে না এখানে!

আর ভর্ৎসনা করে ওকে মারা, সে তো পারবেই না। দুঃখ আক্রোশের মুহূর্তেই শুধু এটা তার মনে হয়েছিল আর তাতে কেবল যন্ত্রণাই বেড়েছে তার।

না, ইভদোকিয়া ছাড়া আর কেউ ওর বৌ হবে না।

অথচ ঐ নষ্টা মেয়ে, হাসি তো মাগীর মতো, ধূর্ত বেহায়া, বুদ্ধিতে ঢেঁকি — তবু মন যে কেবল তারই পানে ধায়, অন্য কাকেও যে চায় না।

ভাবটা যেন উনি বোঝেন না কী নিয়ে গুমরে মরছে ইভদোকিম, কেন তার চোখে ভ্রূকুটি; চায় কেমন শান্ত চোখে, হাসি মুখে। দিই শালীর মুখে একটি থাবড়া কষে, হাসি বেরিয়ে যাক — আঃ কী যে কষ্ট!

মারিউশ্‌কা ওদের প্রতিবেশী, সাত সকালে নির্জন রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। মারিউশ্‌কার মুখখানা লম্বাটে, গাঢ় রঙের ছোট ছোট চোখ দুটি কালো, চঞ্চল। ভারিক্কি হাবভাবে তার নাম আছে, অনেক তার বিদ্যা, শুভাশুভ লক্ষণ সব সে জানে, ঝাড়ফুঁক করে দাঁতের ব্যথা সারিয়ে দেয়, কোন স্বপ্নে কী হয় তা বলে দিতে পারে। ইভদোকিমকে দাঁড় করিয়ে মারিউশ্‌কা বললে:

'জিজ্ঞেস করছিলাম কি, তুমি নিশ্চয় জানো, আহমেদ কি একেবারেই চলে গেছে?'

'আহমেদ আবার কে?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম। প্রশ্নটা না করলে সে হয়ত কখনই ইভদোকিয়ার অতীতটা জানতে পারত না, হয়ত বা যে যন্ত্রণাটা ওকে স্বপ্নেও রেহাই দিচ্ছে না সেটাও অচিরে চলে যেত।

'সে কি, আহমেদকে জানো না?' ভয়ানক অবাক হয়ে পড়ে মারিউশ্‌কা।

'কোনো আহমেদকেই চিনি না।'

মারিউশ্‌কা শালের কোণা দিয়ে চোখ ঢেকে বিব্রতের ভাব করে একটা অস্ফুট আওয়াজ করলে, তারপর পাছে ও আগেই না চলে যায় সে জন্য তাড়াতাড়ি করে সব বললে।

মুদি দোকানের কর্মচারী তাতার আহমেদ ছিল ইভদোকিয়ার প্রণয়ী। ষোলো বছর বয়সেই সে তার সঙ্গে জমায়। বাপ জানত, আপত্তি করেনি। কীই বা বলব বাপের কথা! কেউ কাকে বাধা দিত না। আভদেয়েভের ঝাড় বংশ সবই অমনি ক্ষেপা... সাধ মিটিয়ে কী ফুর্তিই না লুটেছে, মা গো! বাচ্চা হবার কথা ছিল, বাচ্চাটিকে ফেলে দেয়। সে কী, ইভদোকিম এ সব কিছুই জানে না? মারিউশ্‌কার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সবই ওর জানা। এমন ভালোমানুষ, অথচ কিছুই জানায়নি, লোকের ধর্ম নেই... হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে বাচ্চাটিকে ফেলে দেয় আর তারপর থেকে আগের মতোই

যত না ফুর্তি করুক পেট হয়নি। দোকানটা বন্ধ হতে আহমেদ চলে যায়; পরে, মানে অল্পদিন বাদেই ফের আসে, চলল আগের মতো; যায়, আসে, একেবারে সটান ওর কাছে; কী কাণ্ড...

'বিয়ে করল না কেন?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম।

'ও যে তাতার! বিয়ে হবে কী করে? ও আগেই ওকে জানিয়ে রেখেছিল, ওদের ধর্মে তা চলে না। বাপ ওর ভারি গোঁড়া, বুঝেছ... দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটিয়েছে ওরা।'

'ও নেই এখন?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম, দু ঠোঁট ওর পাথরের মতো।

'না, এখন নেই। তুমি যখন ওর ওখানে যাতায়াত করছ তার আগেই ও চলে যায়, একেবারেই চলে যায় কোথাও।'

ইভদোকিম মাথা নেড়ে চলে গেল। ভারি ভারি দীর্ঘ পা ফেললে, কাঁধে ভারি বোঝা নিয়ে যাবার সময় লোকে যেমন চলে তেমনি একটু নুয়ে। এই তাহলে! তার মানে তাহলে এই...

আগে সে ভেবেছিল, বিয়ের পর ওরা দুজন প্রতি সন্ধ্যায় বসে বসে কতো কথা গল্প করে শোনাবে, দুজন দুজনকে সলা পরামর্শ দেবে। তার কিছুই হল না — ওর সঙ্গে কথা কইতেই ইচ্ছে হল না তার, বসে রইল চুপ করে, অনেক কটা সিগারেট খেলে, কাগজ পড়ল তারপর শুতে গেল। সলা পরামর্শ!

কিসের পরামর্শ ওর সঙ্গে? পিরিত করল অন্যের সঙ্গে, আর বিয়ে করল ওকে।

আর তবু ওকে ভালোবাসত সে। ইভদোকিয়া এখনো ঠিক বিয়ের আগের মতোই — ফরসা, সুন্দরী, ফিটফাট। ঘরেও সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রান্না বান্না ভালোই, আর ইভদোকিয়া নিজে — যেন সদ্য নেয়ে এসেছে। কিছু না কিছু একটা নিয়ে সে আছে সব সময়ই, বিনা কাজে বসে থাকত না। সিগারেট খেতে খেতে ও শুনত তার চলা ফেরা, নিঃশ্বাসের শব্দ। ও চলা ফেরা করছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে — এ যে ওর একান্ত প্রয়োজন।

কষ্ট যাতে একটু কমে সে জন্য সে সাথী শেস্তের্‌কিন্‌কে নেমন্তন্ন করত। কাজ করতে করতে শেস্তের্‌কিন্‌ কালা হয়ে গেছে, অকারণে চিৎকার করে কথা বলে, কিন্তু লোকটা ভালো, মনটা সরল। ওর মনে হল, অমন যার বৌ সে নিশ্চয় ভারি সুখী। সারা ঘর ফাটিয়ে ও চ্যাঁচাল:

'অনেক কষ্ট করেছিস তুই? তা করেছিস! কিন্তু কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না! তোর কষ্টের কেষ্ট ঐ — তোর বউ!'

শেস্তের্‌কিন্‌ এলে ভালো লাগত ইভদোকিয়ার। ও নইলে ভারি নিঝুম লাগত ঘরটা। ইভদোকিয়ার মনে হল, ইভদোকিম লোক মন্দ নয়, কিন্তু কেমন একঘেয়ে লাগে ওর সঙ্গে। চুপ করে আছে তো আছেই। যখন আদর করে তখনো মুখে রা নেই,

কথা না কইলে আবার পিরিত কী? আহমেদের ভালোবাসা সে ছিল আলাদা — ওকে সে গল্প শোনাত, হাঁটুর ওপর বসিয়ে দোলাত বাচ্চার মতো, আদরের কতো কথা ওকে শিখিয়েছিল তাতার ভাষায়। আর সারাক্ষণ কেবলি হাসি — শাদা শাদা দাঁত, কালো ভুরু, সরু সরু হাত, দুষ্টুমিভরা আদর... চমৎকার লোক আহমেদ!

এমনি ভাবেই গেল দেড় বছর। ক্রমে অভ্যেস হয়ে গেল দুজনের, মানিয়ে নিলে। ছেলেমেয়ে হয়নি। ইভদোকিমের মনে পড়ত মারিউশ্‌কার ঝাপসা সেই কাহিনীটা, তবু আশা হত ছেলে হবে। ইভদোকিয়া চুপ করে থাকত, কিন্তু মনে মনে তার আগেই জানা যে মা সে কখনো হবে না।

৫

বাপের বাড়ি ইভদোকিয়া যেত কালেভদ্রে।

নাম-দিন আর ইস্টারে বাপকে নমস্কার জানাতে হয়, ক্ষমার দিনে ক্ষমা চাইতে হয়। ইভদোকিয়া আসত স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। মান্যি করে বসানো হত ওদের, আপ্যায়ন করা হত, কিন্তু কেমন আড়ষ্ট লাগত ইভদোকিয়ার, যেন পরের ঘরে এসেছে সৎ-মার মুখ মিষ্টি, কিন্তু মনটা খোলামেলা নয়, হিংসুটে চোখ; আর বাপের যেন বা ভয় হত ইভদোকিয়া বুঝি তার কাছে কিছু চেয়ে বসবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মন খারাপ লাগত নাতালিয়াকে দেখে।

নাতালিয়া তার সৎ-মায়ের আগের পক্ষের মেয়ে, বছর দশেক বয়েস। ড্যাপা ড্যাপা চোখ, কদম ছাঁট চুল আর লম্বা কাঁকলাস ঘাড়ে, বিষণ্ণ কঠোর মুখে ওকে দেখাত বুড়ির মতো। অতিথি এলে ও থাকত দোরের কাছে, চেয়ে চেয়ে দেখত, আর মুখ ফেরাতেই ইভদোকিয়ার চোখে পড়ত ওর অনুদার দৃষ্টি।

ঘরে নাতালিয়াকে ভালোবাসত না কেউ। নাকি আদুরে খ্যানখেনে গলায় মা বলত:

'লোকেদের ছেলেমেয়েরা সব কেমন দ্যাখো — আর আমারটি — হায় ভগবান! কথা শোনে না, মান্যিগণ্যি করে না। পড়তে শিখেছে — কার কাছে যে শিখল, যাই বলতে যাও অমনি কথার মাঝে ট্যাঁক ট্যাঁক করে উঠবে। জানো! আর বেড়ালটাকে কেন বলত, বেড়ালটাকে কেন মেরে ফেললি ছুঁড়ী, এ্যাঁ? জবাব দে!'

নাতালিয়ার ঠোঁট বেঁকে গেল, টানটান হয়ে উঠল মুখটা। চাপা গলায় ঝাঁজের সঙ্গে ও উত্তর দিলে:

'ইঁদুরের পেছনে লেগেছিল কেন?'

হাসির ভান করলে মা:

'বোকা কোথাকার! পেছনে লাগা আবার কোথায়? ওতো খেলা, মজা করা...'

নাতালিয়ার জন্য মায়া হল ইভদোকিমের। ইভদোকিয়ার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে সে বললে:

'মেয়েটার কী হাল করেছে দেখো: লোকের কাছে ঘেঁসে

না, কোণাকানাচ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাথায় হাত বুলোতে গেছি, ছিটকে সরে গেল। কেক দেব, তা নিতেও জানে না, ধন্যবাদ দিতেও শেখেনি, একেবারে গোমড়া মুখো।'

আর আহত ভাবে যোগ করলে:

'আর কত লোকে ছেলেমেয়ের জন্য কাঙাল হয়ে থাকে... অথচ এদের যেন নিজের পেটটা ছাড়া আর কিছুই চাই না।'

ইভদোকিয়া ভাবলে: "আমাদের যদি ছেলেমেয়ে হত, তাহলে ভালো বাপ হত ও।" ওর কাছে কেমন যেন নিজেকে অপরাধী লাগল তার; আরো ভালো করে স্বামীর যত্ন আত্তি শুরু করল ও, ভালো করে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে লাগল, খানিকটা সান্ত্বনা অন্তত থাক তাতে।

আভদেয়েভরা বার দুয়েক নাতালিয়াকে নিয়ে এসেছিল চের্নিশোভদের কাছে, কিন্তু এখানেও ঠিক তেমনি বুনো, অবান্ধবের মতো করলে নাতালিয়া, বড়োদের সঙ্গে বসিয়ে তাকেও আপ্যায়ন করা হচ্ছে এতে যেন কোনোই আনন্দ হল না তার।

শীতের গোড়ায় বুড়ো আভদেয়েভের টাইফাস হল। মা তাকে হাসপাতালে দিলে। ইভদোকিয়া বাপকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, কিন্তু ওকে ঢুকতে দিল না।

তখন সকাল, সবে কাজে গেছে ইভদোকিম। তখনো ঠিক মতো ফরসা হয়নি, রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। চুল্লি ধরাবার জন্য কাঠ ভাঙছে ইভদোকিয়া। হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকল নাতালিয়া।

ওর পরনে লম্বা হাতাওয়ালা মায়ের একটা জামা, পায়ে উঁচু ফেল্ট বুট জোড়াও বড়ো মানুষের। দরজা বন্ধ করে ও দাঁড়ালে চৌকাঠের কাছে, জামাটা এলোমেলো হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর নগ্ন হাঁটু দুটো। ভয় পেয়ে গেল ইভদোকিয়া:

'কী হল তোর? কী ব্যাপার?..'

দরজার হাতলটা ধরে, যেন পালাবার আয়োজন রেখে ফিসফিস করে নাতালিয়া বললে:

'ইভদোকিম কাকা বাড়ি আছে?'

'নেইকো, কী দরকার তোর ওকে?'

'এমনি,' ফিসফিস করে বললে নাতালিয়া। চোখ উল্টে এল ওর, ঘোলাটে হয়ে এল দৃষ্টি। দরজা ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল ও মেঝের ওপর... বুট পরা পা দুটো ওর দু দিকে ছড়িয়ে গেল, ইভদোকিয়া হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথাটা তুলে ধরল। শুনল ফিসফিস করে ও বলছে:

'হাসপাতালে নিয়ে গেছে মাকে... বাবা কাল রাতে মারা গেছে... ঘরে চ্যালা কাঠ নেই, চুল্লী ধরাবার কিছু নেই... কাকু ইভদোকিমের কাছে এসেছি...'

ওর রোগা দেহটা থেকে তাপ বেরুচ্ছিল। চোখ উলটিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল মেয়েটা।

ইভদোকিয়া ওর পোষাক ছাড়িয়ে তুলে নিয়ে ফেল্ট পেতে শুইয়ে দিলে সিন্দুকের ওপর। নাতালিয়ার রোগা রোগা হাতের

কনুইয়ের ওপর দুটো কালশিটে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে। ব্যথিত মায়ায় ইভদোকিয়া মনে মনে বললে: "আহা অনাথা!"

তারপর মনে পড়ল, সে নিজেও এখন পুরোপুরি অনাথ, তাই কাঁদলে। বাপের সঙ্গে তার কখনো কোনো মমতার সম্পর্ক ছিল না, বাপ তাকে কিছুই শেখায়নি, ঘর দোর গোছগাছ আছে, খাবার তৈরি আছে, এই টুকু হলেই যেন তার মিটে যেত — তবু বাপ তার ওপর কখনো মারধর করেনি, তাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, তারপর যখন সে তার পিরিতের ব্যাপারে ঝামেলায় পড়েছিল তখন তার জন্য ভালো একটি পাত্র জুটিয়ে দিয়েছে। ওর মনে হল, এখন বাপ মারা যেতে সে তার সবচেয়ে বড়ো সহায় ও রক্ষক হারাল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে অস্ফুট গলায় বলল:

'কার কাছে তুমি আমায় ফেলে গেলে গো! আমি যে একা পড়লাম গো, ঝড়ের মুখে আমি যে এবার তৃণখণ্ড গো!'

নাতালিয়া বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলে:

'কাকু ইভদোকিম কোথায়?'

আর সারা দিন সজ্ঞানে, প্রলাপের ঘোরে কেবল ওরই খোঁজ করলে। সন্ধ্যার দিকে ইভদোকিয়াকে ও ভুল করে ইভদোকিম বলে। ইভদোকিয়ার হাত তার জ্বরতপ্ত হাতে চেপে ধরে নাতালিয়া মিনতি করলে:

'ইভদোকিম কাকু, ইভদোকিম কাকু, তুমি আমায় মা'র কাছে ফিরিয়ে দিয়ো না, দেবে না তো?'

'না রে বেটি, না,' বললে ইভদোকিয়া, ভারি মায়া লাগল তার, শিউরে উঠল এই অসহায় অসুখী মেয়েটির কথা ভেবে, 'কাউকে দেব না রে, ভয় নেই।'

মা মারা গেল নয় দিনের দিন। ইভদোকিমদের সিন্দুকের ওপর পড়ে পড়ে দেড় মাস ভুগল নাতালিয়া, তারপর উঠে দাঁড়াল ঢ্যাঙা, রোগা হয়ে, মুখটা যেন কেমন নতুন; যেন মৃত্যুর এই গ্রাসের মধ্যে ও জীবন খুঁজে পেয়েছে, রুচি ফিরেছে তার।

অসুখের মধ্যে সে তার পুরনো পোষাকের চেয়ে বেড়ে উঠেছিল, সেই পুরনো পোষাকটি পরেই ছাঁটা চুলে ও হাঁটাহাঁটি করত রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে, প্রতিটি জিনিস নজর করে এমন ভাবে দেখত যেন এই প্রথম জিনিসটা সে দেখলে। সরে আসত জানলায়, ফাঁকা রাস্তায় দেখা যেত তুষার ঝড়ের খেলা, আর কী দেখে যেন হাসত নীরবে। ইভদোকিম খবরের কাগজ নিয়ে আসত, আর নাতালিয়া ঝাপসা-ছাপা কাগজের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে পড়ে যেত তার সবখানি। ইভদোকিম বললে:

'এবার তোকে বই এনে দেব, বেটি।'

আনা হল বই। কেমন যেন খুব তাড়াতাড়িই সেটা পড়ে শেষ করলে নাতালিয়া। ইভদোকিমের ইচ্ছে হয়েছিল পরখ করে দেখে, কিন্তু তার জন্যে নিজেরই বইটা আগে পড়ে ফেলা

দরকার, তার সময় কই! শপকমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল ও, তার নানা কাজ থেকে ফুরসৎ মেলাই দায়।

'তোর স্কুলে যাওয়া দরকার,' ও বললে।

ইভদোকিয়া বাধা দিলে:

'বিদ্যের ঝামেলা রাখো বাপু! দেখছ না কী রোগা দুবলা? ভালো করে খাওয়া দাওয়া করুক, তারপর দর্জির কাছে দিয়ে দেব, ভালো হাতের কাজ শিখুক। কী নাতালিয়া, দর্জি হবি?'

'না, দর্জি হতে চাই না,' রাগ করে কড়া গলায় উত্তর দিলে নাতালিয়া।

তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠল সে। সৎ-মায়ের পুরনো পোষাক কেটে ওর জন্য নতুন পোষাক সেলাই করে দিলে ইভদোকিয়া, ঘরকন্নার ছোটো খাটো কাজ শেখালে। নাতালিয়া সবই করত অনিচ্ছায়, চটপট করে তা সেরেই ছুটত বইয়ের কাছে। শুধু নক্সা তুলতে ভালো লাগত তার: ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত, নিখুঁত ফোঁড় তুলত সুচে, আর কী যেন ভাবত। একদিন ইভদোকিয়া শুনলে, নাতালিয়া গান গাইছে... গান গাইছে আর জ্বল জ্বল করছে মুখখানা, ছেলেমানুষের মতো! বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল ইভদোকিয়ার... একদিন ইভদোকিম বললে, 'শোন নাতাশা, আমায় বাবা বলে ডাকিস, আর ইভদোকিয়াকে বলবি মা। তুইতো আমাদের মেয়েই।' নাতালিয়া আস্তে করে বললে, 'বেশ।'

৬

কারখানা থেকে, ক্রুজিলিখা থেকে ইভদোকিম আসত ট্রেনে। স্টেশনে নেমে ও ধীরে সুস্থে বাড়ির দিকে রওনা হল শহরের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে ছিল শেস্তের্কিন। সিবিরস্কায়া রাস্তার মোড়ে শোনা গেল একটা খ্যানখেনে মেয়েলি চিৎকার:

'ধর, ধর, চোর!'

কে যেন গুড়ি মেরে ছুটে গেল। শুরু হল কয়েক গণ্ডা পায়ের দাপাদাপি। কে একজন ছুটে গিয়ে কাকে আটকালে। ধাক্কাধাক্কি, ধরপাকড়ের পর ধরাশায়ী করা হল একটি ছোটো ছেলেকে।

ফার ম্যাণ্টেল চাপানো, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ফেল্ট বুট পায়ে একটি মহিলা জবড়জং ভঙ্গিতে ছুটল বরফের ওপর দিয়ে:

'চুরি করেছে! চুরি করেছে! কী কাণ্ড মাগো!'

'কী চুরি গেল?' কে যেন জিজ্ঞেস করলে। অন্য কারা বাধা দিয়ে সোরগোল তুললে:

'দে, ফেরত দে!'

'কোথায়? নেই ত ওর কাছে!'

'কাউকে চালান করে দিয়েছে, বল কাকে দিয়েছিস!'

'হতভাগা চোরের হাত থেকে আর রেহাই নেই!'

ম্যাণ্টেল চাপানো স্ত্রীলোকটি ককিয়ে উঠল:

'হাত ব্যাগ! হাত ব্যাগ আমার! মাগো!'

ওর দিকে কেউ মন দিল না, ঘিরে ধরে ছেলেটিকে শায়েস্তা করার জন্যই সবাই ব্যস্ত... ইভদোকিম দুই হাতে ভিড় ঠেলে গিয়ে বললে:

'খুব হয়েছে, হট্টগোল থামাও তো বাপু। নিজেরাই আদালৎ বসিয়ে দিলে যে?'

দানবের মতো দস্তানা পরা হাত দিয়ে জোর করে ও ছেলেটিকে ভিড়ের কবল থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের সামনে দাঁড় করালে:

'হাত ব্যাগটা কোথায়?'

কাঁপা কাঁপা ছেলেমানুষী হাতে ছেলেটা তার গায়ের ন্যাতাকানির ভেতরে পেটের কোথা থেকে যেন বার করে দিলে হাত ব্যাগটা। ইভদোকিম সেটা মেয়েটিকে দেখালে:

'এইটে?'

'হ্যাঁ — হ্যাঁ ঐটে, মাগো,' ফুঁপিয়ে উঠল মহিলাটি।

'উঃ ভারি তো জিনিস, তার জন্য একেবারে কঁকিয়ে সারা!' ছেলেটাকে পেটাবার জন্য যারা জুটেছিল, সেই ভিড়েটার থেকেই কে যেন বললে, 'পরগাছা নেপমান* সব, টাকার শোকে একেবারে গলায় দড়ি...'

---

* নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির গোড়ার পর্বের মুনাফাখোর, ব্যক্তিগত কারবারী। — সম্পাঃ

ইভদোকিম বললে, 'ঈস, একেবারে যে রাজপুত্তুর! আয় আমার সঙ্গে।'

প্যানপ্যান করতে শুরু করলে ছেলেটা, 'ছেড়ে দাও কাকু!' ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছিল থুতনিতে, ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল বরফের ওপর, ভয়ে ভয়ে নাক দিয়ে তা টেনে নেবার চেষ্টা করছিল সে, 'কাকু...'

ইভদোকিম বললে:

'খুব হয়েছে, এখন চল তো।'

ছেলেটাকে সে বাড়ি নিয়ে এল। ইভদোকিয়াকে বললে:

'অতিথি এনেছি, ধুয়ে মুছে খেতে দাও।'

'ঠাণ্ডা জলে আমি গা ধুতে পারি না,' টব থেকে ইভদোকিয়াকে জল ঢালতে দেখে বলে উঠল ছেলেটা, 'অ্যানিমিয়া আছে আমার।'

'আ মরি, কী সুখের প্রাণ!' ইভদোকিয়া বললে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যিই গরম জল এগিয়ে দিলে। ছেলেটা গা হাত পা ধুলে নিতান্ত ওপর ওপর, ভয়ে ভয়ে, যেন তাতে সত্যিই ওর রূপ ধুয়ে যাবে। ইভদোকিয়া পেছন থেকে এসে ঝুঁটি ধরে বিনা বাক্যব্যয়ে মুখ ধুইয়ে দিলে ওর।

'মেরো না আমায়, শালী কোথাকার, মেরো না বলছি!' চেঁচাল ছেলেটা, 'কাকু, দেখো আমার মারছে মাগীটা।'

ধোয়া মোছার পর দেখা গেল ছেলেটার সোনালী চুল, ফ্যাকাশে রঙ, চালাক চতুর মুখ। নাকের ফুটো থেকে তখনো রক্ত বেরচ্ছিল, আঙুল দিয়ে তা আটকাচ্ছিল ছেলেটা।

'উকুন নিয়ে এসেছিস তো সঙ্গে করে,' ইভদোকিয়া বললে, 'গোটা বাড়ি এবার ছড়াবি।' ছেলেটিকে সে পরতে দিলে তার বাপের পুরনো কারখানার প্যাণ্ট আর শার্ট। ইভদোকিমের পোষাকটা খুবই ঢলঢলে হত ওর পক্ষে। আগাগোড়া পরিষ্কার হয়ে ছেলেটা অনিশ্চিতভাবে টেবিলের এক কোণে বসল। ইভদোকিম ওকে এক টুকরো রুটি ভেঙে দিলে। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে হাত আর দাঁত দিয়ে লেগে গেল রুটিটার পেছনে। দুই গালে ওর ফুটে উঠল আপেলের মতো দুটো লালচে গোলালো ছোপ।

"মাগো, কতটুকুই না মানুষের দরকার," ভাবলে ইভদোকিয়া, "ধোয়া মোছা, গরমের পর এখন দেখো দেখি একেবারে অন্য ছেলে, দিব্যি মানুষের মতো।" ওর জন্য এক টুকরো স্তুদেন* কেটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'বাড়ি কোথায় তোর?'

'ভলগা, সামারায়,' টুকরোটা খাবলে নিয়ে জবাব দিলে ও।

'মা বাবা আছে?'

---

* মাংস বা মাছের ঠাণ্ডা জেলি। — সম্পাঃ

'দুর্ভিক্ষের সময় মরে গেছে।'

'নাম কী তোর?'

'আন্দ্রেই।'

ইভদোকিয়া ওকে শোয়ালে চুল্লির ওপর, বেশ গরমে থাকবে ওখানে। ইভদোকিম বললে সকালে একটা অনাথাগারে দিয়ে দেবে ওকে।

সকালে চুল্লির ওপর ছেলেটাকে পাওয়া গেল না, আলনায় নাতালিয়ার গরম কোটটাও নেই। আগের দিন ইভদোকিয়া ছেলেটার যে ন্যাতাকানি ছাড়িয়ে রেখেছিল সেগুলোও সে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

গরম কোট খোয়া যাওয়ায় মেজাজ খারাপ করে ইভদোকিয়া বললে, 'আরো কিছু চোর ছ্যাঁচোড় ডেকে নিয়ে এস ঘরে। এ আর কী হয়েছে!'

ইভদোকিম চটে উঠল:

'চোর ছ্যাঁচোড়!.. আর তুমি একটু বুদ্ধি করে গরম জামাটা আলনা থেকে সরিয়ে রাখতে পারলে না?'

মাস দুয়েক পরে বাজার থেকে ফিরে ইভদোকিয়া দেখে রান্নাঘরে আন্দ্রেই, নোংরা ন্যাতাকানির এক পুঁটলির মতো মেঝের ওপর বসে বাঁধাকপির ঝোল খাচ্ছে। নাতালিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারিক্কী ভাব করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ইভদোকিয়া বললে:

'এই যে! কী, রাত কাটাতে আসা হল নাকি?'

নোংরা মাথা মুখ তুলে আন্দ্রেই বললে:

'আর করব না কাকী; যদি চাও তো তোমার জন্য না হয় কাঠ চ্যালা করে দেব।'

'ঠাণ্ডায় ভয়ানক জমে গেছে ও, জুতো খুলে নিয়েছে ওর,' নাতালিয়া বললে।

সত্যি সত্যি আন্দ্রেইয়ের একেবারে খালি পা। ওর ছোটো ছোটো কালশিটে পা দুখানা দেখে বুক কেমন করে উঠল ইভদোকিয়ার। নিজে সে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ফিরেছে গায়ে ভেড়ার লোমওয়ালা পোষাক, মাথায় দু' দুটো শাল আর পায়ে ফেল্ট বুট পরা থাকলেও ঠাণ্ডায় ওর নিজেরই ঠোঁট বলে কাঠের মতো হয়ে গেছে। তবু সে সইল না, বকুনি দিয়ে বললে:

'আর গরম কোট? গরম কোটটা কোথায়? কোটটি বেচে দিয়ে এখন নিজে খালি পায়ে ফিরে এসেছিস তো?'

'আঃ মা,' ভুরু কুঁচকিয়ে বললে নাতালিয়া, 'জানোই তো, তাহলে আবার জিজ্ঞেস করা কেন?'

'কী জানিস তুই?' ইভদোকিয়া জিজ্ঞেস করলে।

'বকো আর ঝকো, কোটটা তো আর নেই!' বললে নাতালিয়া। 'খালি পেট খালি পা লোককে ঠাণ্ডায় খেদিয়ে দেওয়া ভালো নয় মা।'

ইভদোকিয়া চিন্তিতভাবে চুপ করে গেল।

তারপর শালটা খুলতে খুলতে ফের বললে:

'ঠিক মতো বস। মেঝের ওপর কুকুরে খায়, বেড়ালে খায়, লোকে খায় টেবিলের সামনে বসে... গামলা নিয়ে আয় নাতাশা, আমি গরম জল দিচ্ছি। দাঁড়া দেখি অ্যানিমিয়ার রোগী, গা ধো।'

৭

নাতালিয়া আর আন্দ্রেইকে স্কুলে দেওয়া হল। ইভদোকিম নিজে তাদের জন্য খাতা, ব্যাগ, পেনসিল-কেস কিনে দিলে।

নাতালিয়া পড়াশুনায় খুব ভালো করলে। মাস্টাররা ওর প্রশংসা করত:

'খুব বুদ্ধিমান মেয়ে, ভালো রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত।'

আর আন্দ্রেই সম্পর্কে বললে:

'আলসে, বেয়াড়া, ওকে নিয়ে জ্বালাতনের এক শেষ।'

সন্ধ্যায় রান্নাঘরে বসে পড়া তৈরি করত নাতালিয়া আর আন্দ্রেই ওকে জ্বালাত:

'কেন যে খেটে মরছিস, তুই তো মেয়ে: বড়ো হবি, বিয়ে হবে, ছেলে বিয়োবি, আর এসব ভুলে যাবি।'

'কক্ষনো নয়, মোটেই ভুলে যাব না,' উত্তর দিলে নাতালিয়া।

'বাজে কথা, সব ভুলে যাবি। বিয়েটি হবে আর তোর পাটিগণিত, ভূগোল মুগোল সব ভুলে বসবি।'

'বিয়েই করব না আমি,' উত্তর দিলে নাতালিয়া।

'হবেই বিয়ে। কোনো কাজে লাগবে না তোর পড়াশুনো। কেবল সময় নষ্ট, সংসারের কাজ কম করতে হচ্ছে এইটুকু লাভ।'

'মা,' অন্যায় সইতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া, 'দ্যাখো কী সব বাজে কথা বলছে ও!'

'জ্বালাস নে ওকে! সত্যি, কেন ওর পেছনে লেগেছিস বলতো?' ইভদোকিয়া থামাত ওকে।

দ্বিতীয় বছরেও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে রইল আন্দ্রেই। 'কী করা যায় তোকে নিয়ে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম। চোদ্দ বছর যে বয়স হল আন্দ্রেইয়ের। তাজা ছটফটে ছেলেটা, কথায় খুব সেয়ানা, পড়াশুনা ছাড়া আর সব কাজেই খুব আগ্রহ। জল আনত, কাঠ চেলা করত, ইস্ত্রি ধরাত, হাঁড়ি বালতি মেরামত করত। ওকে নইলে ইভদোকিয়ার চলত না।

ইভদোকিমকে আন্দ্রেই বললে, 'কারখানায় ঢুকিয়ে দাও আমায়। স্কুলের বেঞ্চে ছানাপোনাগুলোর সঙ্গে বসে থাকতে ব্যাজার লাগে।'

'আর কারখানায় আড্ডা দিয়ে বেড়াবি না তো।'

'না বেড়াবো না, মাইরি বলছি।'

কয়েক দিন পর ইভদোকিম বললে:

'শেস্তেরকিন তোকে শিক্ষানবিশ হিসাবে নেবে। ওর সঙ্গে কাজ করবি প্রেস ঘরে। তবে দেখিস! কারখানায় আমায় সবাই জানে। আমার মান আমার কাছে বড়ো কথা। তুই আমার ছেলে। দেখিস বেটা, আমাদের মজদুরের মান রাখিস, বুঝেছিস?'

আন্দ্রেই বললে যে বুঝেছে। সত্যি সত্যিই শেস্তেরাকিন ওর কাজে খুশি হল; বলতে গেলে অবাকই হল এই ভেবে যে, এমন চালাক চতুর ছোকরা স্কুলের পড়াশুনায় খারাপ করল কেন। আন্দ্রেই তারপর থেকে সকালে বেরিয়ে যেত ইভদোকিমের সঙ্গে। মরদ হয়ে উঠল ও, সিগারেট খেতে শুরু করল, জাঁক করত তার কারখানার নোংরা জামাটার গর্বে। প্রথম মাইনেটা যখন সে ইভদোকিয়ার হাতে এনে দিলে তখন এমন অহঙ্কার ফুটে উঠল ওর মুখে যে নাতালিয়ার হিংসেই হল।

পড়াশুনাটা নাতালিয়া কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না। কঠিন একটা লক্ষ্য রাখলে সে নিজের সামনে: বিদুষী মেয়ে হতে হবে তাকে, সোফিয়া কভালিয়েভ্‌স্কায়া কি মারি ক্যুরির মতো। চোদ্দয় পড়ল সে, দেহ গড়ে উঠতে লাগল, ঘন হয়ে বেড়ে উঠল তার খাটো বেণী। আরো বড়ো যাতে দেখায় তার জন্য এ বেণী সে চুড়ো করে রাখত মাথার ওপরে। ভরে উঠল ওর সরু গ্রীবা, সরু সরু হাত। বান্ধবীদের সঙ্গে একদিন ফোটো তুলেছিল সে; ফোটোটা দেখে ইভদোকিয়ার মনে হল, ভারি সুন্দরী হয়ে উঠছে তো নাতালিয়া।

৮

ব্লিনি গ্রাম থেকে চিঠি আসত কালেভদ্রে, আর কেবল জরুরী কিছু একটা অদলবদলের খবরই জানানো হত তাতে: যেমন কেউ হয়ত বিয়ে করেছে অথবা কেউ মারা গেছে, এমনি।

পুত্রকন্যার জন্মের কথা জানানো হত নেহাৎ কথায় কথায়, প্রসঙ্গক্রমে, কেননা ইভদোকিমের চার ভাই আর তিন বোনই বেঁচে, প্রতি বছরেই ওদের ছেলে হত, আর সের্গেই নামে ভাইটির বউ তো দু দু'বার জমজ ছেলে বিইয়েছে। পরিবারের প্রতিটি নতুন সংযোজনের খবর দেবার সময় কই। মা'র শুধু এই দেখে অবাক লেগেছিল যে ইভদোকিম তার নিজের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই লেখে না; বার দুয়েক সে অনুরোধ জানিয়েছিল: "লিখিস বাছা, এই বুড়িকে নাতি-নাতনি কি দিলি, তা লিখিস, নাম জানাস।" কিন্তু এর জবাব না পেয়ে বুড়ি আর শুধোয়নি। সারা চের্নিশোভ বংশে কেবল একা — একলা ইভদোকিমই নিঃসন্তান, অথচ ছেলের জন্য তার কি আর সাধ কম?..

গ্রীষ্মকালে এল এক চিঠি, তাতে শতকোটি আভূমি প্রণাম জানাবার পর লেখা হয়েছে:

"পরে আপনাকে নিবেদন করি যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিওতর নিকলায়েভিচ ইহলোকের মায়া কাটাইয়াছেন, তাহার কারণ হার্নিয়া, ও সাতটি পেট রাখিয়া গিয়াছেন, বড়ো মেয়ে আফ্রোসিনিয়া ১৫ বৎসর, ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ আন্তনিদা ইলিনিচনা স্বয়মপি অসুস্থা, এই পিতৃহীনগুলিকে লইয়া কী করিবে তাহার জ্ঞান নাই। আপনার উপদেশ পরামর্শ বাঞ্ছা করি, কারণ পিওতরের পর আপনিই এখন ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শহরে বাস করেন, আমাদের অপেক্ষা উপায় নিরুপায় সব

ভালো জ্ঞাত আছেন, কোথায় সরকারী খরচে অনাথগুলিকে প্রেরণ যায় এবং একদিনের জন্য হইলেও যদি এখানে আসা আপনার পক্ষে কোনোক্রমে সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমাদের বড়ো উপকার হইবে।"

সের্গেই ভাইটি তার একটু ধূর্ত, তার এই জটিল ধরা ছোঁয়া না দেওয়া চিঠিটি পড়ে ইভদোকিমের ভাবনা হল। আন্তনিদাকে মনে পড়ল, তার মাথায় একটা ন্যাকড়া, অনবরত কোঁকাচ্ছে। অপরিচ্ছন্ন কুড়ে ঘর, আধ ভাজা শানগা। সাত সাতটি ছেলেকে মানুষ করা যাবে কোথায়? ছেলেগুলির কথা মনে করার চেষ্টা করল সে, পারল না: বছর চারেক আগে সে সাত দিনের জন্য ব্লিনি গিয়েছিল, প্রতিটি ঘরেই এক কাঁড়ি করে ছেলেমেয়ে, তার মধ্যে কোনগুলি পিওতরের?.. সাতটা পেট, সোজা কথা নয়...

আত্মীয়রা তো ঠিকই করে রেখেছে এ দঙ্গলটাকে চাপাবে সোভিয়েত সরকারের ঘাড়ে। "সরকারী খরচ।" এহ, হায়রে আমার সব গণ্যমান্য আত্মীয়! ক'দিনের এই প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সবে তো অনাথ এতিমদের ব্যবস্থা শুরু করেছে, বাস্তুহারা ছেলেমেয়েদের শিশুসদনে দিয়েছে। কেন, আমরা চোর্নশোভরা কী এতই হীনবল যে পিওতরের ছেলেমেয়েদের চাপাতে হবে সরকারী তত্ত্বাবধানে? ওদের জন্য একটু ঠাঁই, একটুকরো রুটিও আমাদের জুটবে না?

ইভদোকিম তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানির দিকে চেয়ে দেখল। ভালো হোক, মন্দ হোক, তারই সংসারেই তো আছে নাতালিয়া আর আন্দ্রেই। ওরা থাকায় হাসিখুশি লাগে তার, দেখে মনে হয় ইভদোকিয়াও খুশি। যাই হোক, মাগী খারাপ নয়: ওই তো বসে বসে আন্দ্রেইয়ের প্যাণ্ট রিপু করছে। আন্দ্রিউশকা ওর কে? অন্য মেয়ে হলে ওকে হেনস্তা করে মারত আর দেখো, ও ওকে কিনে দিয়েছে নরম চামড়ার জুতো। বলে, আন্দ্রেইয়ের টাকায়। ও কথা যেন আন্দ্রেইকে শোনায়। ছোঁড়াটার জন্য অমন জুতোর কী দরকার? না বন্ধুর বিয়েতে যাবে, সাজগোজ যেন কারো চেয়ে খারাপ না হয়। শপকমিটির সভাপতির পোষ্য পুত্র বলে কথা... আন্দ্রেই যে "মা মা" করে বেড়ায়, সেকি সাধে... না, খাঁটি কথা, মাগীটার মন ভালো। নিজের ছেলে তো নেই — পরেরটার ওপর টান।

আর পিওতরের ছেলেমেয়েরা তো পরও নয় ভাইপো, ভাইঝি, রক্ত সম্পর্ক। সাতটা পেট, হুম... দুটো হলে নেওয়া যেত। নাতালিয়া আর আন্দ্রেই তো বড়োই হয়ে উঠেছে। আন্দ্রেই কাজ করছে, নিজেরটা নিজেই চালাবার চেষ্টা করছে। যাওয়াই দরকার ক্লিনিতে।

ছুটি নিয়ে ও যাত্রা করল। ইচ্ছে ছিল ইভদোকিয়াকেও সঙ্গে নেয়, কিন্তু মনে হল মেয়েরা ওকে ঘিরে আলোচনা করবে, কেন বাঁজা, তাই নিয়ে কথা উঠবে, ভেবে কষ্ট হল তার, তাই ঘরেই রেখে গেল।

ব্লিনিতে সবই সেই আগের মতো, শুধু মা ভারি ভেঙে পড়েছিল, চেয়ে থাকত কবরের দিকে। ইভদোকিমের আসার খবরে জুটল গোটা পরিবার, ভাই, বোন, বৌ, জামাই — একেবারে গোটা গাঁ। সবাই ওকে নিয়ে গেল আন্তনিদার কাছে। আন্তনিদা আগেই খবর পেয়েছিল, অপেক্ষা করছিল মাথায় আধ ডজন ন্যাতা জড়িয়ে। ইভদোকিমকে দেখিয়ে দেখিয়ে আন্তনিদা বারবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, ককালে যেন মরতে তার আর বাকি নেই... গেরস্থালি মন্দ নয় তার — গরু, দুটি বাছুর, বিশটি ভেড়া। পিওতর ভাই এ সবের ঝামেলা একাই বইত, হার্নিয়ায় মরবে না তো কী!

বৈঠক চলল কাক ডাকা ভোর পর্যন্ত, আলোচনা হল পিওতরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী করা হবে। নিজের কাছে তিনটিকে রাখতে রাজী হল আন্তনিদা: ছোটো দুটিকে, তার একটি সবে হাঁটতে শিখেছে — আর মেয়ে আফ্রোস্‌কাকে, এ মেয়েটি এর মধ্যেই বড়োসড়ো বুদ্ধিমতী হয়ে উঠেছে, সব ভার ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বড়ো দুটি ছেলেকে নিলে বোন পেলাগেয়া, গ্রাম সোভিয়েতের সভানেত্রী। রইল বাকি দুই — নয় বছরের পাভেল আর পাঁচ বছরের কাতিয়া। ইভদোকিম বললে, এ দুটিকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, পোষ্য নেবে, মানুষ করে তুলবে। ভেবেছিল, ভাইয়েরা তাতে খুশি হবে, কিন্তু কেমন জানি তানা-নানা করতে লাগল। ব্যাপার কী,

সেটা সে অনেকক্ষণ ধরেও বুঝতে পারল না। পরে বুঝতে পেরে রেগে উঠল; ছেলেমেয়েদের জন্য আন্তনিদা বকনা বাছুর দিচ্ছিল: ভাইয়েদের সেটা মনঃপূত লাগেনি। ইভদোকিম উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বলল:

'বকনা আমার লাগবে না। নিজের মেহনতেই সংসার চালাতে পারি আমি, ভগবানের কৃপায় সোভিয়েত রাজের আমলে আমাদের মজুর শ্রেণীর কোনো নালিশ নেই। গরু নেই, ভেড়া নেই আমাদের, কিন্তু তোমাদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি আমরা, রোগ জ্বালা কম। আর ভাইয়ের অনাথ দুটিকে আমি খাওয়াতে পারব, বকনার দরকার হবে না, চুলোয় যাক তোমাদের বকনা!'

ভাইদের বিবেকে লাগল, পাল্লা দিয়ে ওরা ইভদোকিমকে বোঝাতে চাইল বকনাটা যেন সে নেয়। ইতিমধ্যে পেলমেনি তৈরি হল। আন্তনিদা কুঁথিয়ে ককিয়ে আফ্রোস্‌কাকে পাঠাল মাটির নিচের ভাঁড়ারে তাড়ির জন্য। পিওতরের আত্মার স্মৃতির জন্য পান করা হল আবেগ ভরে, দ্বিতীয় দফা পানের পর গোটা পিপে উড়ে গেল।

৯

হঠাৎ মন খারাপ লাগতে লাগল ইভদোকিয়ার। আন্দ্রেইও চলে গিয়েছিল বিশ্রাম সদনে। সন্ধ্যায় কার জন্যই বা অপেক্ষা, কার জন্যই বা রাঁধা। নাতালিয়া আর ইভদোকিয়া মাত্র এই

দুজন; আলসেমি লাগত চুল্লি ধরাতে; অক্রোশকা* খেয়ে সামোভার নিয়ে বসতেই যেন পেট ভরে আসত, তারপর কিছুই করার নেই। আঙিনায় সবজি বাগান ছিল একটা, কিন্তু ইভদোকিয়ার হাতে দুপুরের আগেই সেখানকার কাজ সব সারা হয়ে যেত। নাতালিয়ার ভাগ্য ভালো: কেবল বই নিয়ে কাটিয়ে দিত সারা দিন; আর ইভদোকিয়া কী করবে?

নিজের জন্য কাজ গড়ত সে: যত মোজা ছিল সব বসে বসে রিপু করলে, ফেলে দিলে দোষ হবে না এমন মোজাও সে বাদ দিলে না; ছোটো ছোটো গোলাপ আঁকা ছিট কিনলে সে, অনেকদিন চেয়ে চেয়ে দেখলে, বালিশের ওয়ার সেলাই করলে। সেলাই করত, হাই তুলত আর ভাবত আহমেদের কথা। কোথায় উধাও হল? জীবনে উৎসব এনে দিত সে। কেমন মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে থাকত ইভদোকিয়ার দিকে, কী আদরই না করত!.. কী ভালোই না হত যদি ও একবার আসত, দিনকয়েকের মধ্যেই যেন সারা দেহ, সারা মন ফুটে উঠত তার, সব উজাড় করে উপভোগ, ভালোবাসা... তারপর ফের সেই মামুলী, চিরাচরিত, সামান্য জীবন... কিন্তু আহমেদ, সে যেন ডুমুরের ফুল।

ইভদোকিমের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল। এর আগে ইভদোকিয়া কখনো টেলিগ্রাম পায়নি। কথা কটা যে তার বেয়ে

---

* কাঁচা শাকসব্জী ইত্যাদি দিয়ে সহজে তৈরী খাদ্য বিশেষ। — সম্পাঃ

এসেছে — নাতালিয়া তাই বোঝালে, — এতেই যেন মানে মর্যাদায় ভরে উঠল ইভদোকিয়া। ইভদোকিম জানিয়েছিল যে সে দুটি বাচ্চা আর একটি বকনা সঙ্গে নিয়ে আসছে, ইভদোকিয়া যেন তাদের জন্য সব কিছু তৈরি রাখে। হাসি পেল ইভদোকিয়ার: আরো দুটি বাচ্চা! দেখো কাণ্ড! শিগগিরই বালিশে আর কুলাবে না!

নাতালিয়া আর ও দুজনে মিলে ঘরদোর দেখে শুনে ঠিক করলে, যতদিন না খাট হয় ওরা ততদিন বেঞ্চি জোড়া দিয়ে বারান্দায় শোবে। বকনাটার জন্য উঠোনের একটা চালা পরিষ্কার করলে ইভদোকিয়া। জানা কথা যে শীতে এটা চলবে না — বারান্দায় একটা গরম কুঠরির ব্যবস্থা করতে হবে।

কুরিয়ায় গিয়ে ইভদোকিয়া বিচালির দরদস্তুর করলে। টাকায় কুলাল না, তাই সেটা অগ্রিম দিয়ে পরে হিসাব মেটাবার কথা দিতে হল।

দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ইভদোকিম ফিরে এল, এল গরুর মালগাড়িতে করে বকনাটি, আন্দ্রেই এল বিশ্রাম সদন থেকে, আহমেদের কথা ভাবার আর সময় রইল না। দেখা শোনার কাজ পড়ল এত যে সারা দিনেও কুলাত না।

বাচ্চা দুটিকে ভালো লাগল ইভদোকিয়ার। ছেলেটা ছিল খাশা, ইভদোকিমের মতো দেখতে, দুষ্টু দামাল নয়, বসে বসে কেবল ছবি আঁকত। সব কিছু নজর করে দেখে সে একদিন শুধালে:

‘আচ্ছা কাকীমা, নাতাশা আর আন্দ্রিউশা তোমায় মা বলে, আর আমি আর কাতিয়া কেন বলি কাকী?’

‘নাতাশা, আন্দ্রিউশার মা নেই ত,’ জবাব দিলে ইভদোকিয়া, ‘আর তোদের মা যে বেঁচে। তাছাড়া আসলেও যে আমি তোদের কাকী।’

পাভেল বললে, ‘মা তো আমাদের চায়নি। মা শুধু আফ্রোস্‌কাকে, পারানিয়াকে আর ভিত্‌কাকে চেয়ে রেখেছে।’

এর জবাব কী দেবে ভেবে না পেয়ে ইভদোকিয়া বললে, ‘হয়েছে, এখনো তুই ছোটো, এখনি মা’র নিন্দা কিরে?’

পাভেল চুপ করে গেল। দিন কয়েক পরে বললে, ‘কাকী, তা হোক, আমরা তোমায় মা বলে ডাকব।’ আর কাতিয়াকে বললে, ‘কাত্‌কা, দুনিয়া* কাকীকে তুই মা বলে ডাকবি, বুঝলি?’

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করলে কাতিয়া।

‘আমাদের মা তো আমাদের চায়নি, তাই।’

‘মাটা আমাদের খারাপ, না?’ জিজ্ঞেস করলে কাতিয়া।

‘হ্যাঁ, খারাপ,’ পাভেল বললে, ‘কিন্তু মায়ের নিন্দা করিস না যেন কাত্‌কা, তুই এখনো ছোটো।’

কাতিয়া বললে, ‘আচ্ছা বেশ।’

---

* ইভদোকিয়া নামের সংক্ষেপ। — সম্পাঃ

কাতিয়াটা দেখতে একটা নতুন বলের মতো আঁটসাঁট, গোলাপী। কষ্ট হত ইভদোকিয়ার। ইচ্ছে হয়েছিল চামচে করে ওকে খাইয়ে দেয়। কিন্তু কাতিয়া চামচে কেড়ে নিয়ে চেঁচাত:

'আমি নিজের হাতে খাবো, নিজে নিজে খাবো!'

ইভদোকিয়ার সাধ হয়েছিল, ওকে এপ্রন দিয়ে বো বেঁধে সাজায়। কিন্তু ফিতেগুলো কাতিয়া হারিয়ে ফেলল, এপ্রনটা ছিঁড়ে ছুটে আছাড় খেতে থাকল। এই ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে, মুহূর্তের মধ্যেই দেখবে এখানে কাটা, ওখানে ফোলা, নোংরা হয়ে ঘুরছে। ইভদোকিয়া ধৈর্য ধরে ধোয়াত মোছাত ওকে, বলত:

'ছিরি দেখো মেয়ের!'

'আমি নিজে, আমি নিজে!' গা রগড়াবার ছিবড়েটা কেড়ে নিয়ে চেঁচাত কাতিয়া।

ছোটোগুলোর ওপর তাচ্ছিল্য ছিল নাতালিয়ার। ভয় ভয় করত পাভেলের।

একদিন সে বললে, 'আপনার পুশকিন রচনাবলী বইটা নেবো একটু?'

তাচ্ছিল্য ভরে নাতালিয়া জবাব দিল:

'নিবি নে, কিন্তু কিছুই তো বুঝবি না।'

'আর লাল নীল পেনসিলটা?'

'নিতে পারিস, তবে ভাঙিস না যেন।'

কিন্তু একদিন তার চোখে পড়ল, পাভেল আঁকছে। লাল

নীল পেন্সিলটা দিয়ে আঁকা হয়েছে: চোর্নোমোরের বাগানে লুদমিলা*। বাগানটা সব নীল রঙের আলো ছায়ায় আঁকা, লুদমিলা কেবল লালে, গাঢ় নীলের পটে আগুনের শিখার মতো... মাথা নিচু করে, ঠোঁট কামড়ে পাভেল নীলাভ চিকন পাতাগুলোকে রাঙিয়ে তুলছিল, পেছন থেকে নাতালিয়া দেখছে তা লক্ষ্য করেনি।

'এটা তুই এঁকেছিস?' অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে নাতালিয়া। ও আড়চোখে চেয়ে দেখলে নাতালিয়ার দিকে, উশখুশ করে লাল হয়ে উঠল।

'কেন ভালো হয়নি!' ও বললে একটু ইতস্তত করে, ছবিটা দেখতে দেখতে; ততক্ষণে সাহস ফিরেছে তার। মুখ ফিরিয়ে সে চোখাচোখি চাইলে নাতালিয়ার দিকে।

'খুব চমৎকার হয়েছে,' ভারিক্কির ভাব করে জবাব দিলে নাতালিয়া। পাভেল ছবিটা নিয়ে এগিয়ে দিল ওর দিকে:

'নাও, তোমায় দিলাম।'

'দিলে কষ্ট হবে না তো?'

'উঁহুঁ। এমন কতো আঁকতে পারি,' ও বললে, 'শুধু আঁকার জিনিস নেই।'

নাতালিয়া ছবিটা দেখে বললে:

---

* পুশকিনের "রুসলান ও লুদমিলা" কবিতার নায়িকা। — সম্পাঃ

'তুই আমার রঙগ্ুলো নে। আর এ পেনসিলটা তোর কাছেই থাক, চিরদিনের মতো।'

অক্টোবর বার্ষিকী নাগাদ আন্দ্রেই বাড়িতে বিজলী নিয়ে এল। রান্নাঘরে শোবার ঘরে এবার বাতি দ্ুলল, ঝকঝকে ফটফটে আলো ছড়াল তা থেকে: শোবার ঘরে কাচের ধ্ুতরো ফুলের মতো ঢাকনা, রান্নাঘরে সব্ুজ টিনের শেড দেওয়া। আর যে নতুন গোয়ালটায় বকনার জায়গা হয়েছিল সেখানেও বিজলী বাতি গেল। কারখানায় ইভদোকিম বলে বেড়াল:

'ছেলেটাই আলো নিয়ে এল নিজে নিজেই, মিস্ত্রি ডাকতে হয়নি।'

'দাঁড়া না, তোর ব্যাটাকে আরো কতো কী শেখাব।' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে শেস্তেরকিন, 'তার জন্য জানিস আমায় কী দক্ষিণা দিতে হবে, জানিস?'

'কী দক্ষিণা?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম।

কিন্তু শেস্তেরকিন নিজেই জানত না, আন্দ্রেইকে শেখাবার জন্য কী দক্ষিণা তার পাওয়া উচিত। আন্দ্রেই নিজে নিজেই কাজ করতে শ্রু করেছে ততদিনে। তব্ু দিনে বার কয়েক করে এসে শেস্তেরকিন নিজে যা জানত তা সব তাকে শিখিয়ে যেত। এমন ব্ুঝদার সাকরেদকে ছেড়ে দিতে মায়া হত তার।

৭ই নভেম্বরের শোভাযাত্রায় গেল চের্নিশেভদের গোটা পরিবার। নাতালিয়া গেল তার স্কুলের সঙ্গে, আন্দ্রেই তার

কারখানার ছোকরাদের দলে, আর ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ইভদোকিয়া গেল ইভদোকিমের সঙ্গে। ক্যাতিয়া রইল ইভদোকিমের কাঁধে।

১০

কলঘরে নতুন যন্ত্র বসল, যে প্রেস এল, তেমন জোরালো প্রেস কেউ আগে দেখেনি। শেস্তেরকিন ভাবলে, তাকে বরখাস্ত করা হবে, কেননা তার বিদ্যেয় এ নতুন যন্ত্রে চলবে না, মনের দুঃখে মদ ধরল সে। কিন্তু বরখাস্ত হতে হল না, তার নতুন কাজ হল ছোকরাদের তালিম দেওয়া, এমন কি মাইনেও তার বাড়ল।

ইভদোকিম বললে, 'আহাম্মুকির জন্যই তোর ছাঁটাই হওয়া উচিত, সত্যি দুঃখ হয় তোর জন্য! নেশা না করলে মাথাটা তোর খাশা!'

শেস্তেরকিন চ্যাঁচালে, 'থাম, থাম, বকিস না! ভেবেছিস সরকারী মেসিনে আমার জায়গা খাবে? মেসিন সরকার কেনে, বেচে কিন্তু মাথা আমার আর কোনো টাকাতেই কেনার নয়।'

নৈপুণ্যে বৃদ্ধির পাঠক্রমে পড়তে ঢুকল ইভদোকিম: নতুন টেকনিক, নতুন কোটার সামনে এ নইলে যে সেরা মজুর হিসাবে নাম টেকে না। ফাঁকা সময় তার আরো কমে গেল; তবু নিজের নানা কাজের মধ্যেও সে পরিবারের কথা, তাদের এটা ওটা দরকারের কথা ভোলেনি। ঠিক করলে, এত ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে আর বাস করা চলে না, পাশ ফেরার জায়গা নেই।

ইভদোকিয়াকে বললে, 'আমাদের গর্টারও জায়গা বেশি। কিরে, আন্দ্রেই, ঘর তুলব একটা?'

'সে কথা আর বলতে, তুলব বৈকি।'

'দুজনে পারবি?'

'খুব পারব।'

'তাহলে হিসেবপত্তর কর তো দেখি,' হুকুম দিলে ইভদোকিম, 'ঠিকঠাক হিসেব করিস, আজেবাজের মধ্যে যাস না।'

সে সময় অনেক মজুরই ঘর বানায়, কিস্তিবন্দিতে মালমসলা পাওয়ার অসুবিধা ছিল না: এক গ্রীষ্মেই শেস্তের্কিনের সাহায্যে খোলামেলা ঘরখানা উঠল। এতে শুত পাভেল আর আন্দ্রেই। আন্দ্রেইয়ের কাছে এখানে আসত তার বন্ধুরা। গিটার বাজাত, দিব্যি গান গাইত, আর মাঝে মাঝে, খবরের কাগজের কিছু একটা নিয়ে তর্ক করত ও এমন চেঁচাত যে মনে হত এই বুঝি মারামারি বাধে। ইভদোকিয়া তাদের জন্য নিয়ে আসত চা, জলখাবার; আন্দ্রেই যে বড়ো হয়ে উঠেছে, গড়া পেটা শরীর, সুন্দরপানা মুখ, নিজের খুশিমতো সব সঙ্গীসাথী, আপন একটা আকর্ষণীয় জীবন — এটা দেখে ভারি ভালো লাগত তার। আর ঘরের কোণে শান্তভাবে বসে পাভেল এদের গান বাজনা তর্কবিতর্ক শুনত, আর রগুড়ে সব ছবি আঁকত।

আর হঠাৎ ফের দেখা দিল আহমেদ।

কিসের যেন একটা ধাক্কায় ইভদোকিয়া একদিন দৈবক্রমে

জানলার কাছে উঠে আসতেই চোখে পড়ল আহমেদ। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহমেদ জানলায় চেয়ে দেখছিল ওকে। নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ওভারকোট আর মেষচর্মের টুপি ভিজে জবজব করছে। আত্মহারা ইভদোকিয়া যেন হঠাৎ ডানা মেলে ভেসে গেল অলিন্দে। ভেজা মুখে, শাদা দাঁতে জ্বলজ্বল করে উঠে আহমেদ তার বাহুমূল ধরে সজোরে চাপ দিলে।

'একী, তুমি, আহ... লোকে দেখবে... চলে যাও...' যেন কিসের একটা ঘোরে অস্ফুট স্বরে সে বললে। কিন্তু নিজেই সে সরে এল না, লক্ষ্যও করলে না যে কার্নিশ থেকে বৃষ্টির ধারা এসে পড়ছে কাঁধে, মাথায়।

তাড়াতাড়ি করে আহমেদ বললে:

'অন্ধকার হলেই চলে এসো, রাজগুলিয়াই-য়ে, রুটির দোকানের কাছে, অপেক্ষা করে থাকব।'

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে চলে গেল আহমেদ। মোড় ঘোরা না পর্যন্ত ইভদোকিয়া চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ফিরল, দুপায়ে যেন তার কিছু নেই।

অন্ধকার হতে অভিসারে বেরুল সে।

১১

ফিরল দেরি করে — শরতের অন্ধকার ভেজা রাতে কটা বেজেছে বোঝা দায়।

আহমেদ বলেছিল, তার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে সে এগিয়ে দেয়। বিদায় নেবার আগে অচেনা নানা ফটকের নিচে ওরা বহুক্ষণ ধরে ফিসফিস করেছে, চুমু খেয়েছে।

বাড়ির সব জানলাই অন্ধকার। ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অল্প জোরে টোকা মারল অন্ধকার জানলায়। ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে ধাক্কা দিতে হবে — ইভদোকিম আর ছেলেমেয়েগুলোর ঘুম খুব কড়া, — কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় সিঁড়ির ধাপে খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘটাং করে উঠল হুড়কো। দরজা খুলল পাভেল। গায়ে ওর শুধু একটি জামা, নিঃশ্বাস ফেলছিল ভয়ে ভয়ে।

'সরে যা, আমি নিজেই বন্ধ করছি,' চাপা গলায় বললে ইভদোকিয়া, 'কি, ঘুম নেই তোর? যা, যা, ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবি।'

পাভেল কথা না শুনে দাঁড়িয়ে রইল পাশে, যতক্ষণ না হুড়কো লাগালে ইভদোকিয়া; ওর নিঃশ্বাস শুনেই বোঝা যাচ্ছিল, শীতে কাঁপছে। ইভদোকিয়া ওর কাঁধ ধরে টেনে নিয়ে এল:

'শো, শুয়ে পড়, ঘুমো।'

'ঘুমবো না আমি।' জোরে বলে উঠল পাভেল।

চুল্লির তাকে উশখুশ করে উঠল নাতালিয়া। ইভদোকিয়া ফিসফিসিয়ে উঠল:

'আস্তে! সবাইকে জাগিয়ে দিবি যে।'

'কেউ ঘুমচ্ছে না, এক কাতিয়া ছাড়া,' পাভেল বললে, 'বাবা আন্দ্রিউশাকে নিয়ে তোকে খুঁজতে গেছে। কোথায় গিয়েছিলি মা?'

'শো বলছি,' ইভদোকিয়া বললে। 'কী অবাধ্য ছেলে বাপু!'

মুড়িশুড়ি দিয়ে ওকে শুইয়ে দিলে ইভদোকিয়া, নিজেও তাড়াতাড়ি করে পোষাক ছাড়লে, শুয়ে পড়ল আলো না জেবলে। শুল কিন্তু ঘুমল না, অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কান পেতে রইল, ইভদোকিম আন্দ্রেই কখন ফেরে। বৃষ্টি ঝেঁপে এল, ঝম ঝম শব্দ শুরু হল ছাতে... বিবেকে লাগল, ওরা সারা দিন খেটেখুটে এসে এখন বৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে, ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়নি, ওর জন্য জেগে বসে আছে। নিজেকে ও বোঝাতে চাইলে, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও তো কারো ক্ষতি করেনি, অন্যদের জন্য লোকে নিজের আনন্দ ছেড়ে দেবে এমন নিয়ম হতে পারে না। "আমার জন্য ছুটোছুটি করতে কেউ তো ওকে বলেনি, শুয়ে ঘুমলেই হত।" মনে মনে ভাবলে ও। তবু কে যেন কানে কানে বললে, ও নিজে কলঙ্কিনী, এই সৎ মানুষগুলোর মধ্যে একা ওই অসতী। "হা ভগবান, কেন যে ও ফিরে এল," ভাবলে আহমেদ সম্বন্ধে আর সেই মুহূর্তেও জানত, পরের দিন ফের যাবে অভিসারে, তারপর ফের চুপি চুপি বাড়ি ফিরবে, ছেলেমেয়েগুলোর সামনে লজ্জায় আড়ষ্ট হতে হবে আবার।

ইভদোকিম ও আন্দ্রেই ফিরলে দেরি করে সর্বাঙ্গে ভিজে,

রাগে গড়গড় করতে করতে। মিলিসিয়া, মর্গ কোথায় না ওরা গেছে... ইভদোকিয়া নিজেই দরজা খুলে দিলে, আহত ক্রুদ্ধ একটা ভাব ফোটালে মুখে।

'কোথায় গেছলে?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে ইভদোকিয়া বললে:

'কোথায় গেছলে, কোথায় গেছলে! গেছিলাম সইকে প্রসূতি-সদনে পেঁছে দিতে; ছুটোছুটি করে একটা কেলেংকারী না বাধালে তো তোমার ঘুম হচ্ছিল না!'

সই মাশা অভ্‌চিন্নিকভার সঙ্গে ইভদোকিয়ার আজ ছ'মাস দেখা নেই, কালকে হঠাৎ কানে এসেছিল যে মাশা প্রসূতিসদনে যাচ্ছে।

'কোন সই?'

'অভচিন্নিকভা মাশা। যাচাই করতে চাও? বেশ, যাও, যাচাই করে এসো, আন্দ্রিউশকাকেও সঙ্গে নিয়ো...'

'যাবার সময় বলে গেলেই হয়,' ইভদোকিম বললে ক্লান্ত হয়ে। বিছানার ওপর উঠে বসল ইভদোকিয়া, লজ্জা আর জেদের কান্নায় গলা বুঁজে এল তার:

'বেশ, এই তোমায় বলে দিচ্ছি, কাল সন্ধ্যায় ফের মাশাকে দেখতে যাব হাসপাতালে, শুনলে?'

'চেঁচিয়ো না,' ও বললে কঠোর গলায়, 'ছেলেমেয়েদের একটু শান্তি দাও।'

ইভদোকিয়া শান্ত হয়ে এল, ভোর অবধি ঘুম এল না তার।

কার ওপর যেন একটা রাগ — নাকি এ রাগ নিজের ওপরে? — একটা মর্মপীড়া, আরো কী সব অনুভূতি যার নাম সে জানে না, বুকে চেপে রইল তার...

পরের দিন অভিসারে আহমেদ এল না। ইভদোকিয়া অপেক্ষা করে ছিল, দাঁড়িয়ে রইল রুটির দোকানের পাশে, তারপর হয়রান হয়ে ভাঙা মনে বাড়ি ফিরল।

ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি ফিরল। ইভদোকিম তার রোজকার অভ্যাস ভেঙে আগেই এসে গেছে — রান্নাঘরে বসে বসে ফেল্ট বুট মেরামত করছিল। কাতিয়া আর পাভেল ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে; ওদের কী যেন একটা বলছিল ইভদোকিম, হাসির কথা কিছু, কেননা হাসছিল ছেলেরা।

ইভদোকিম বললে, 'দ্যাখ বৌ, কেমন খাসা সেলাই করে দিলাম তোর ফেল্ট বুট,' তারপর একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'উঁ, কেমন আছে মাশা, ছেলে হল?'

'জানি না,' নিষ্প্রাণ গলায় উত্তর দিলে ও, 'আমি যাইনি।'

মিথ্যে বলার শক্তি ওর আর ছিল না, এখন ওর কাছে সবই সমান। কালকে ওকে দেখে আহমেদের মনে ধরেনি নাকি, এমন ব্যবহার করলে ওর সঙ্গে? গোয়াল ঘরে গিয়ে বসে বসে কাঁদলে ইভদোকিয়া।

ইভদোকিম যেন কিছুই নজর করলে না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রগড় করলে, তারপর রাতের খাওয়ার পর ওরা দুজন যখন একলা হল, শুধু তখন বললে:

'শোন, বস দেখি, আমাদের এ যে কী হল, তা নিয়ে কথা কইতে হবে। ভালো হচ্ছে না ব্যাপারটা। আগে যা হয়েছিল, হয়েছিল... তা নয় যাক। কিন্তু আর ছলনা চাই না! চাই সৎ জীবন!' এই বলে সে তার চওড়া শক্ত হাতের চেটো দিয়ে থাবড়া মারলে টেবিলের ওপর। 'আহমেদকে চাস? বেশ আহমেদের সঙ্গে থাক। কিন্তু লুকিয়ে ওর কাছে যাওয়া চলবে না, বুঝেছিস? আমি আজ ওকে কেবল একটু ঝাঁকি দিয়ে এসেছি। আর একটু জবর হলে হয়ত প্রাণেই বাঁচত না। আর তোর জন্য, বোকা মাগী কোথাকার, আমি যদি গিয়ে জেলে বসে থাকি, তাহলে ছেলেমেয়েগুলো কোথা যাবে? বেনো জলে ভাসিয়ে দিবি? সে কথা ভেবেছিস? তোর কি মন নেই, বিবেক নেই, আছে কেবল মেয়েলি লালস? বাজে কথা, মন আছে, বিবেকও আছে, নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা তোর আছে।'

'ওর কী করেছিস তুই?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিয়া।

চিন্তিত ভাবে মোচে হাত বুলোলে ইভদোকিম:

'মানে... গিয়ে বললাম, ওকে চাস তো ধম্মভাবে নে, নইলে সরে পড়, কাছে পিঠে যেন না দেখি! কিন্তু ও নেশা করেছিল না কি করেছিল, ঘুষোতে এল। দেখো একবার... অল্প একটু সমঝে দিলাম: লাগতে আসিস না! যেমন বুদ্ধিমান, মামলাও ঠুকে দিতে পারে হয়ত।'

ইভদোকিয়া দুই হাতে মুখ ঢেকে রইল। ও বলে গেল:

'কান্না রাখ, আমার কথাটা বুঝে দেখ। আমি তো আর সাবেকি আমলের জুলুমবাজ কিছু নই যে তোকে জোর করে বেঁধে রাখব। যদি ওকে এতই ভালোবাসিস যে ওকে ছাড়া বাঁচবি না, তবে ভালোবাস, তার আর কী করা যাবে। কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই!.. ভাবছিস, বুঝি ঘরদোর কী হবে? ভয় নেই, রাস্তায় তাড়িয়ে দেব না। এ ঘরে যেমন ছিলি, তেমনি থাকবি — এ বাড়ি তোর।'

অবাক হয়ে ও চাইলে ইভদোকিমের চোখে:

'আর তুই?..'

'আমার কথা তো উঠছে না। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য বাড়ি তুলব,' ও বললে, 'ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে যাবে! আহমেদকে দেব না। আর তুই যদি চাস, তবে তোকে দেব, কিন্তু খুব খারাপ লাগবে। ও বদমাইসটাকে বিশ্বাস নেই, এক আধলাও বিশ্বাস করি না ওকে, বিবেক নেই লোকটার ...কিন্তু তোর ব্যাপার, তুই বোঝ।'

ইভদোকিম উঠে দাঁড়াল। ওর বিব্রত মুখ দেখে নিরানন্দে হাসলে একটু:

'এই আর কী দুনিয়া। এই আমার কথা। যা করবার স্থির করে নে তাড়াতাড়ি। আহমেদ আমাদের যে অবস্থায় ফেলেছে, তেমন ভাবে দিন কাটানো তোর কাছে, আমার কাছে, কারো কাছেই মজার নয়। খোলাখুলিই বলি, গত একটা রাতেই আমার জীবন থেকে যেন দশ বছর খসে গেছে। বেছে নে। গোপন অভিসারে

ছুটবি — সেটি হবে না। আমি তোর বাপের মতো নই, আমার কাছে ওসব ফাজলামি চলবে না, সে আশা নেই। তোর জন্য আমায় যে জবাবদিহি করতে হবে, বুঝেছিস?'

নিশ্চল হয়ে বসে রইল ইভদোকিয়া। ও চলে গেল, শোবার ঘরে নয়, অন্য ঘরে ছেলে দুটির কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চুপ করে গেল বাড়িটা, ও একা বসে রইল সে নীরবতার মধ্যে, যেন মানিয়ে নিতে চাইল তার ভবিষ্যৎ একাকীত্বের সঙ্গে।

এমনি ভাবেই ও সন্ধ্যায় বসে বসে অপেক্ষা করবে আহমেদের, ছাতে মুখর হয়ে উঠবে বৃষ্টি — আসবে কি আহমেদ, নাকি আসবে না, — ওকে যে ভরসা করা যায় না, ও যে ঠগ, হোক না সুন্দর, হায়রে সুন্দর...

অবিরাম শব্দ তুলবে বৃষ্টি আর বাড়িখানা হয়ে আসবে নীরব, মৃত।

আর ঐ যারা ঘরে প্রাণ নিয়ে এসেছে, তারা চলে যাবে, তার যত্ন আত্তির অপেক্ষায় থাকবে না, প্রতি দিন তাদের কাছ থেকে রাজ্যের খবর শোনা, তাদের এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করা তার আর হবে না, আর যদি বা ওদের কারো সঙ্গে দৈবক্রমে দেখা হয়, অভ্যাসবশে ওকে মা বলে ডাকে, — তবে তার যে কোনো মানেই আর থাকবে না।

অঝোরে কাঁদলে ইভদোকিয়া।

ওদের কথা ভেবে কষ্ট হল তার, ভয়ঙ্কর লাগল যে

আহমেদের জন্য ওরা এখান থেকে চলে যাবে। চলে যাবে এই জন্য যাতে এ ঘরগুলোতে আহমেদের সঙ্গে তার প্রণয়লীলা চলে।

আর সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, ইভদোকিম চলে যাবে, চলে যাবে সদয়, বুদ্ধিমান, খাটিয়ে লোকটা, যে নইলে না হত ঘর, না থাকত সংসার।

আহমেদের জন্য চলে যাবে ইভদোকিম, এত বড়ো অন্যায় যে অসম্ভব। হুহু করে ফুঁপিয়ে উঠল ইভদোকিয়া।

ইভদোকিমের কানে গিয়েছিল সে কান্না, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে সে আসেনি। ইভদোকিয়া ফোঁপালে, ফোঁপালে তারপর ভাবলে: "কাঁদছি কেন বোকার মতো, ইভদোকিম তো নিজেই বলে গেছে বেছে নিতে। বললে বেছে নে। মন যা চাইবে তাই বাছব — কে এখানে থাকবে কে থাকবে না।"

এই ভেবে শান্ত হয়ে এল সে, মনে হল কাঁধ থেকে যেন পাহাড় নেমে গেল — মুখ ধুলে, হাসিমুখে সুখবোধ দোষবোধ মিলিয়ে প্রার্থনা করলে ইভদোকিম আর ছেলেমেয়েগুলোর জন্য, নিজেরও কুশলের জন্য, তারপর শুতে গেল। সকালে ইভদোকিম আর আন্দ্রেই কাজে যাবার জন্য ঘুম থেকে উঠে দেখে, রোজকার মতো চুল্লিধরানো, সকালের খাবার তৈরি, টেবিলে ভারিক্কি গিন্নিপনা চলেছে ইভদোকিয়ার।

এ কাহিনীটা ওরা কাউকে বলেনি। তবু কে জানে কোথা থেকে কারখানায় গুজব ছড়াল — হয়ত সবজান্তা মারিউশ্‌কার

কাছ থেকে, ইভদোকিমকে ওই তো কানে কানে জানিয়েছিল যে আহমেদ ফিরেছে... গুজব রটল, আর একদিন ইনস্ট্রুমেণ্টমিস্ত্রি মকেয়েভ, লোকটা ঝগড়াটে, ভারি মুখ খারাপ, আন্দ্রেইয়ের ওপর কী জন্য যেন চটে উঠে তাকে বললে, "খানকীর বেটা"। আন্দ্রেই মারতে ছুটে যায়, আটকানো যায় না ওকে; মকেয়েভের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েও ও বার বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মকেয়েভের গায়ে জোর বেশি, কিন্তু ছেলেটার এই ক্ষেপামি দেখে ভড়কে পিছিয়ে যায়, বলে:

'ডাঁট কিসের তোর, কিসের ডাঁট? কিসের? মা তোর তো তাতারের সঙ্গে ঘোরে। বুদ্ধু কাঁহিকার!'

জনকয়েক লোক আন্দ্রেইয়ের হাত পাকড়ে ওকে টেনে নিয়ে আসে, বসায়। মকেয়েভ ওর দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। রক্তের থুথু ফেলে ও বললে, 'হোক গে, শালাকে দেখে নেবো।'

কমসোমল কমিটিতে ডাক পড়ল আন্দ্রেইয়ের। নরম গরম কথায় বোঝানো হল ওকে, কিন্তু ডেঁটে রইল ও:

'দুচক্ষে দেখতে পারি না ওকে। মা আমার গা থেকে উকুন বেছে দিয়েছিল...'

শুধু যখন হুমকি দেওয়া হল কমসোমল থেকে বের করে দেওয়া হবে, কেবল তখনই ও হাতের মুঠোটা কামড়ে কাঁদলে, কথা দিলে মকেয়েভের পেছনে লাগবে না।

বৌকে ইভদোকিম বলেনি কী নিয়ে মকেয়েভের সঙ্গে মারপিট হয় আন্দ্রেইয়ের। আহমেদের কথা ওদের মধ্যে আর

ওঠেনি। আহমেদকেও দেখা গেল না আর — শাদা দেঁতো শয়তান, মুহূর্তে হাজির হল কোত্থেকে, জল ঘোলা করলে, আগুন জ্বালালে, হৈচৈ তুললে — তারপর ফের উধাও।

১২

কে যেন টোকা দিলে জানলায়। তখন সন্ধ্যা, ছেলেমেয়েরা সবে ঘুমিয়েছে, ইভদোকিম তখনো কারখানা থেকে ফেরেনি, বোঝাই যায় মিটিঙে আটকা পড়েছে। দরজা খুলতে গেল ইভদোকিয়া। ফাঁকা রাস্তা, একটি লোক নেই, আস্তে আস্তে বরফ পড়ছে। ইভদোকিয়া ফের দরজা বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ কী যেন ট্যাঁ ট্যাঁ করে উঠল তার পায়ের কাছে। ভালো করে চেয়ে দেখে, দাওয়ার ওপর অনতিবৃহৎ একটি ছেয়ে রঙের বাণ্ডিল, ট্যাঁ ট্যাঁ করছে বাণ্ডিলের ভেতর থেকে। বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে এসে সে ময়দার বাক্সের ওপর রাখলে।

ভেজা ন্যাকড়াগুলো খুলে বার হল একটি শিশু। একটি ছেলে, সপ্তাহ পাঁচেকের হবে, ঘাড় শক্ত হয়ে উঠেছে। ছাড়া পেয়ে পা গুটিয়ে আনল পেটের কাছে। মুখের কাছে মুঠো তুলে খেতে চাইলে। মাথা বাঁকিয়ে বললে, "এঁ-এঁ-এঁ" আর কাঁদলে। ইভদোকিয়া ওকে বুকে তুলে শান্ত করতে চাইল শিস দিয়ে। মুখে তার ফুটে উঠল ব্যাকুল গম্ভীর ভারিক্কি একটা ভাব: এ যেন ওরই ছেলে, মুখে যেন তার মাই গুঁজে দেবে সে।

"এঁ-এঁ" বলে ছেলেটা কান্না থামাল, মুখ দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ওর ব্লাউজ। ফের ওকে শোয়াতেই একটা অসহায় চিৎকারে নালিশ জানালে ছেলেটা। ইভদোকিয়া চুল্লির কাছে ছুটে গিয়ে একটা ছোটো বোতলে গরম দুধ পুরে পরিষ্কার ন্যাকড়ার পলতে বানিয়ে খেতে দিলে ছেলেটাকে। "এঁ-এঁ" দুধের গন্ধ পেয়ে আক্রোশে চেঁচালে ও, তারপর মুখে সলতে ধরে তৃপ্ত হয়ে বললে, "আ!" আর চুক চুক করে চুষতে লাগল।

'ইশ, আচ্ছা পেটুক তো!' ভালোবেসে তারিফের সুরে বললে ইভদোকিয়া।

খাওয়ানোর পর গামলায় গরম জল ঢেলে ছেলেটাকে ধোয়াতে বসল সে। হাত পা ছুঁড়তে লাগল ছেলেটা, কিন্তু কাঁদলে না; সযত্নে ওকে ধুইয়ে সব মেয়েই যেমন করে তেমনি করে তার পিঠ থেকে জল টেনে নিলে ঠোঁট দিয়ে — লোকের কুদৃষ্টি, কুবাক্য লাগবে না, সুস্থ সবল বুদ্ধিমান হয়ে বেড়ে উঠবে ছেলেটা। তারপর ওকে নিয়ে এল শোবার ঘরে, খাটের ওপর।

'দেখো এবার খোকামণি কেমন পরিষ্কার, কেমন সুন্দর।' গা মোছাতে মোছাতে বললে ও।

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে কেবল বাতিটার দিকে ফেরার চেষ্টা করতে লাগল। পুরনো চাদর দিয়ে ইভদোকিয়া মুড়লে ছেলেটাকে। মোড়ার পর ওকে দেখাল একটা শাদা পোকার

মতো, ঠিক তেমনি করে মাথা নাড়িয়ে আঁকুপাঁকু করছিল ছেলেটা; স্নানের পর মাথায় চুলগুলো ওর কালো কালো হয়ে উঠল।

'নে, হল, এইবার শুয়ে ঘুমো!' নিজের লেপটি দিয়ে ওকে ভালো করে ঢেকে বললে ইভদোকিয়া, তারপর দেখতে গেল, কী যৌতুক সঙ্গে নিয়ে এসেছে ছেলেটি।

ছাই রঙের মোড়কটার মধ্যে পাওয়া গেল একটা রঙচটা শেমিজ, একটুকরো কম্বল, আর পুঁটলি করার মোটা ক্যানভাস। এসবই ইভদোকিয়া ছুড়ে ফেলে দিলে বারান্দায়। তা থেকে মেঝের ওপর উড়ে পড়ল একটা কাগজ। ইভদোকিয়া তুলে নিলে, কাগজে লেখা: "আলেক্সান্দর নামে দীক্ষিত।" ইভদোকিয়ার মনে হল বেশ নামটি আলেক্সান্দর, শুরা, সাশা, সানিয়া — যেমন খুশি ডাকা যাবে, আলিক-ও বলা যাবে...

ইভদোকিম এল; ভারি ক্লান্ত আর কেন জানি অপ্রসন্ন মুখ নিয়ে অনেকখন ধরে ঝোলানো জলপাত্র থেকে হাত মুখ ধুলে। ইভদোকিয়ার ভয় হল — যদি ও ছেলেটাকে না রাখতে চায়! পোষাক বদলে ইভদোকিম নীরবে টেবিলে বসল, আর ইভদোকিয়া রাতের খাবার এগিয়ে দিয়ে ভাবলে, কী করে কথাটা পাড়া যায়।

কথা শুরু করার জন্য ও জিজ্ঞেস করলে, 'মিটিঙে তোমাদের এত দেরি হল কেন গো?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলে ও:

‘একজনার বিচার হচ্ছিল। কারখানার মালপত্তর নিয়ে ও বাসন তৈরি করে বেচে দেয়, টাকাটা পোরে নিজের পকেটে।’

‘কারা বিচার করলে?’

‘আমরাই বিচার করলাম, মিটিং।’

‘মিটিং?..’ নিজের কথাটা ভাবতে ভাবতেই চিন্তিতভাবে পুনরুক্তি করলে ইভদোকিয়া। তারপর সোজাসুজি বলে বসল:

‘শোবার ঘরে আলো জেবলে ঢুকো, খাটের ওপর না দেখে শুনে হুড়মুড়িয়ে উঠো না, ছেলে চাপা দিয়ো না।’

‘কীসের ছেলে?’

‘ভগমান খোকা পাঠিয়েছেন।’

খাওয়া শেষ করে ইভদোকিম শোবার ঘরে গেল: পেছু পেছু ইভদোকিয়া। আলো জেবলে কম্বল তুলে ইভদোকিম চেয়ে দেখলে শান্ত গোলাপী মুখখানার দিকে।

‘কার ছেলে এটা?’

ইভদোকিয়া বুক ফুলিয়ে বললে:

‘ভেবে নাও, আমাদেরই।’

ঘুমোচ্ছিল ছেলেটা, ঘুমের মধ্যে ঠোঁট নড়ছিল।

‘ফেলে দিয়ে গিয়েছিল বুঝি?’

‘ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এতে আমাদের মঙ্গলই হবে,’ হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় ও তাড়াতাড়ি আওড়ালে, ‘কুড়োনো ছেলে ভগমানের দান!’

ঝকঝকে আলোয় অসুবিধা হচ্ছিল ছেলেটার, মাথা

ঝাঁকাতে লাগলে, পুঁটলির মধ্য থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে।

ইভদোকিম হাসল:

'বলছিস, খোকা?'

'আলেক্সান্দর ওর নাম।'

'কোত্থেকে জানলি?'

'সঙ্গে কাগজে লেখা ছিল।'

খাটে বসে ও জুতো খুলতে লাগল।

শিশুটার দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে, 'বটে, বটে! আর আমি শোব কোথায়?'

'দেয়াল ঘেঁসে শোবে। আমি শোব একে নিয়ে ধারে।'

সন্তর্পণে তাদের বিশাল লেপখানা গায়ে টেনে ইভদোকিম বললে, 'হঠাৎ যদি রাত্রে চাপ লাগে ওটার?' কথায় তার আর রহস্যের সুর ছিল না। 'একটা দোলনা বানাতে হবে ওটার জন্য, নইলে সত্যি বিপদ হতে পারে, হাড় তো ওটার নরম...'

১৩

চের্নিশোভদের ঘরে কী এল তা দেখতে জুটল পাড়া প্রতিবেশীরা। ছেলেটার তারিফ করলে সবাই, তারিফ করলে চের্নিশোভদের, গালমন্দ করলে যত লক্ষ্মীছাড়ী মাদেরকে, রাত করে বরফের মধ্যে পরের দোরে যারা এমন নির্দোষ শিশুকে ফেলে আসতে পারে!..

মারিউশকাও এল। এল ভারিক্কি চালে, অকুণ্ঠ পদক্ষেপে। পাভেল, কাতিয়া, নাতালিয়া ওকে দেখে চুপ করে গিয়েছিল। অনুচ্চস্বরে, কিন্তু বেশ কর্তাত্বি করে ও তাদের জিজ্ঞেস করলে, ভালো করে পড়াশুনা করছে তো সবাই, ধম্ম বাপ-মায়ের কথা শোনে তো, আর ও কি ঘরের মধ্যে পায়ে জুতো পরে ঘোরা কেন; ঘরের ভেতরে তো ঠাণ্ডা নেই, জুতো জোড়ার একটু যত্ন নিলে দোষ হবে না, এমন একটা দঙ্গল পুষতে ধম্ম বাপ-মায়ের খরচ তো কম হয় না। তারপর মুরুব্বির সুরে ডাক্তারের মতো হুকুম করলে, কই ছেলেটাকে দেখাও তো দেখি।

সাশেঙকাকে* নিয়ে এল ইভদোকিয়া, মোড়ক করে জড়ানো, মাথায় লেস-দেওয়া টুপি। মারিউশকা নিঃশ্বাস ফেললে:

'টিকবে না।'

ভয় পেয়ে গেল ইভদোকিয়া:

'সে কী! কেন?'

'ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখ,' ফিসফিসিয়ে বললে মারিউশকা।

ওর নীল, নির্ভাবনার চোখদুটিতে চাইলে ইভদোকিয়া, চোখের মণিতে দেখলে নিজের মুখের ছায়া; এ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

'কোণের দিকে,' ফিসফিসিয়ে বললে মারিউশকা, 'যেগুলো

---

* সাশা নাম থেকে আদরের ডাক। — সম্পাঃ

টেকে তাদের চোখের কোণে যেন একটা ফুটকি বসানো, পরিষ্কার দেখা যায়। তোর এই কুড়িয়ে-পাওয়াটার চোখে ফুটকি দেখা যাচ্ছে না। বাঁচবে না।'

উপস্থিত সকলকে বিমর্ষ করে, কিসমিস কোয়াস খেয়ে চলে গেল মারিউশকা।

পরের দিন পেট খারাপ করল সাশার। ইভদোকিয়া তাকে ক্যাস্টর অয়েল দিলে, পেটে পুলটিশ চাপালে, কিন্তু কিছু উপকার হল না। ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হল।

'ছেলেকে ঠেসে খাইয়েছেন খুব!' মাথায় কালো চুল, গায়ে শাদা গাউন চাপান লেডি ডাক্তারটি রাগ করে বললেন, 'যা রুটিন বেংধে দেব সেইভাবে খাওয়াবেন।'

চার ঘণ্টা পর পর সাশাকে খাওয়াতে বললেন ডাক্তার, রাত্রে একদম কিছু না, দুধ দিতে হবে ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে। ডাক্তারের কথা অমান্য করার সাহস হল না ইভদোকিয়ার, কিন্তু বুক ওর মোচড়াতে লাগল, কেননা ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেতে চাইত সাশা, ক্লান্তিতে নেতিয়ে না পড়া পর্যন্ত ক্রমাগত চ্যাঁচাত "এং-এং-এং"।

"নিজেরটা হলে অমন পোড়ার মুখো রুটিন বেংধে কেমন মারতিস দেখতাম," ডাক্তারের সম্বন্ধে ভাবলে ইভদোকিয়া, "না খেয়েই যে ছেলে চোখ ওলটাবে।"

ছেলে কিন্তু চোখ ওলটালে না, রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেল, রাত্রে শান্ত হয়ে ঘুমতে শুরু করলে। এটা মার্চের ঘটনা। আর

এপ্রিলেই পাভেল স্কুল থেকে ঘুংড়িকাশি নিয়ে এসে সারা ঘরে ছড়ালে। সাশাও বাদ গেল না। বড়োরা অল্পের ওপর দিয়ে গেল, কিন্তু সাশার এমন টান ধরত যে তার কাশির প্রতিটা দমকে ইভদোকিয়া আতঙ্কে ভাবত, এই বুঝি ম'ল। অনেকক্ষণ ধরেও নজর করে দেখলে সাশার চোখে — লোককে আয়ু দেয় যে ফুটকি, তা কিন্তু ওর চোখে কিছুতেই পাওয়া গেল না। কাশি শেষ হল — তারপর কাতিয়া আর সাশা ভুগলে হামে।

জ্বরে পোড়া ছেলেটার দিকে চেয়ে ইভদোকিম বললে, 'এটা অতো সহজে যাবে না। ওইটুকু ক্ষুদে প্রাণ, কতো আর সইবে। কপালে শোক আছে, দুনিয়া।'

চওড়া চেটো মেলে ও বৌ'এর চুলে হাত বুলাতে লাগল। তৃতীয় মাস ইভদোকিয়া ছেলেকে ছেড়ে আর নড়ত না; শুকিয়ে গেল ও, হাসত না।

'এ শোক আমি সইতে চাই না গো,' কেমন একটা নতুন স্বরে সে বললে ইভদোকিমকে, এমন স্বর সে কখনো শোনেনি। 'সইতে চাই না, চাই না।'

ইভদোকিয়ার মনে হল, সাশা যদি মারা যায় তবে আর কোনো দিন জীবনে আনন্দ হবে না তার।

গোটা বসন্ত আর গ্রীষ্মের আধাআধি ছেলেটা ভুগলে। জলবসন্ত হল, তারপর দাঁত উঠল। নিস্তেজ, কাহিল হয়ে পড়েছিল ছেলেটা। উঠোনে ওর জন্য একটা চালা নামানো হয়েছিল, সেখানে সে থাকত। কাতিয়া, পাভেল আর নাতালিয়া

পালা করে তার কাছে বসে বসে মশা মাছি তাড়াত। এদের মধ্যে ছেলেটাকে সবচেয়ে ভালোবাসত কাতিয়া, তার খাটে নিয়ে আসত নিজের খেলনাপাতি পুতুল, বকবক করে যেত ওর সঙ্গে:

'কী সুন্দর আমাদের সাশেঙ্কা, কী বুদ্ধি আমাদের সাশেঙ্কার, কী রূপ আমাদের সাশেঙ্কার!'

আর বিষণ্ণ চোখে কাতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে দুর্বল সুরেলা গলায় সায় দিত সাশেংকা: 'আ-আ-আ!'

ঘরের মধ্যে এটা ওটায় ব্যস্ত থাকলেও জানলা দিয়ে ইভদোকিয়া নজর রাখত সাশার দিকে। একদিন উঁকি দিতে গিয়ে দেখলে, সাশার খাটের কাছে অচেনা কে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কথা কইছে কাতিয়ার সঙ্গে। ইভদোকিয়ার কানে গেল, মেয়েটি বলছে:

'না, না, বাঁচবে না। তোমাদের খারাপই হল একেবারে।'

আঙিনায় গিয়ে ইভদোকিয়া জিজ্ঞেস করলে:

'কী চাস তুই, ক্যাঁক ক্যাঁকাচ্ছিস? কী কাজ তোর এখানে?'

'আমার আবার কাজ কী,' জবাব দিলে মেয়েটা।

'তাই তো বলি। লোকে আমার ছেলেকে চোখ দিলে, আবার বাড়ি বয়ে এসে কথা শোনায়।' প্রায় কান্না এসে গিয়েছিল ইভদোকিয়ার, 'ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো বাছা।'

মেয়েটা মুচকে হেসে ফটকের দিকে চলে গেল। যুবতী, দেখতেও মন্দ নয়। শুধু একটু বেশি মোটা, মুখে

একটা অসুস্থ ফুলো ফুলো ভাব। হালকা রঙের বব ছাঁটা চুল ছোটো ছোটো কুণ্ডলীতে পাকানো। মোটা মোটা পায়ে বহু ব্যবহৃত এক জোড়া বেঁকে যাওয়া হীল-তোলা জুতো...

গ্রীষ্মের শেষাশেষি হঠাৎ ফিরে এল আহমেদ।

চের্নিশোভদের বাড়ির পাশ দিয়ে কয়েকবার ও যাওয়া-আসা করলে কারো সাড়া পেল না। ফটকের ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখলে, ছেলেপিলেয় আঙিনাটা ভরা, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে আলু খুঁড়ে তুলছে, আর একটি মেয়ে গাছের একটা শাখা দিয়ে হাওয়া করছে দোলনার ওপর আর বই পড়ছে, দোলনায় শুয়ে শুয়ে আবোল-তাবোল বকছে একটি শিশু। আহমেদ আস্তে করে শিস দিয়ে চলে গেল। পরের দিন ইভদোকিয়ার কাছে এসে হাজির হল মারিউশকা:

'তা, সাশা তোর আছে কেমন?'

'ভগবানের ইচ্ছায় ভালোই আছে,' ইভদোকিয়া বলল আবেগভরে। বসে বসে টকসরবৎ খাওয়াচ্ছিল সে সাশাকে। দুজনের মুখই হাসিখুসি।

'পরের ছেলেকে নিয়ে নিজেকে যে বিলিয়ে দিলিরে যৈবনবতী,' মারিউশকা বললে দরদ দেখিয়ে, 'বয়স তো, সুন্দরী, চিরদিনের নয়।'

সাশার থুতনি থেকে সরবতের ধারানিটা চামচে দিয়ে টেনে নিয়ে ইভদোকিয়া সুর টেনে টেনে মজা করে বললে:

'কী বা আমাদের যৌবন, কী বা আমাদের রূপ? আমাদের সব বুড়োটে ব্যাপার।'

'আ-আ-আ,' জবাব দিলে সাশেঙ্কা।

'শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দেব, ছেলের বৌ আনব...'

'আ-আ-আ,' সায় দিলে সাশেঙ্কা।

'আহমেদ ফিরে এসেছে,' শুকনো গলায় বললে মারিউশকা, শোভনতার জন্য কড়িকাঠের দিকে তাকালে একবার, তারপর ইভদোকিয়ার দিকে।

সাশেঙ্কার খাওয়া শেষ হল, ইভদোকিয়া তাকে ভেজা গামছায় মুছিয়ে চুমু খেয়ে বললে:

'দেখেছি। জানলার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।'

মারিউশকা ঠোঁট চেটে বললে:

'কুঙ্গুরে গিয়ে ওর কপাল ফিরেছে, সমবায়ের পাইকার হয়েছে, বেশ রোজগার করে, বড়ো লোক হয়ে গেছে। তোর জন্য উপহার এনেছে, মোটা শাল একখানা, আর একখানা পাতলা মতো, পার্শী নক্সা তোলা, কাশ্মীরী টুকরো দুটো, একটা গাঢ় লাল রঙের, একটা গাঢ়-নীল। বলে, বড়ো কষ্ট, বলে, ইভদোকিম খুন করতে শুধু বাকি রেখেছিল, কিন্তু ভুলতে পারছি কই।'

'তো দ্যাখ তাহলে, দ্যাখ আমরা কেমন,' সাশেঙ্কাকে উদ্দেশ করে বললে ইভদোকিয়া, 'আমাদের জন্য আবার উপহারও দেবে, কুঙ্গুর থেকে চলে আসবে! আর আমরা ওকে বলে দেব,' সাশেঙ্কার হাত তালি দিয়ে খেলা করতে করতে ও বলে চলল,

'আর আমরা ওকে বলব: কুঙ্গুরে ফিরে যাও বাপু তোমার পার্শী নক্সা নিয়ে...'

তা সত্ত্বেও কিন্তু আহমেদ দেখা করলে ইভদোকিয়ার সঙ্গে, জল আনতে যাবার সময় রাস্তায়। পথ আটকে শক্ত ছোট্ট হাতে কব্জি চেপে ধরল ইভদোকিয়ার।

'কী দুনিয়া? ভেবেছিস কী? আমায় দূর করে দিতে চাস? আহমেদ তোর এখন খারাপ হল, না?'

রোদ্দুরে চোখ কুঁচকে হাসিমুখে ও তাকালে আহমেদের দিকে:

'খারাপ কোথায়? যা ছিলে তার চেয়ে বরং আরো ভালো। কিন্তু আমার আর দরকার নেই।'

'দরকার নেই,' আহতভাবে অবিশ্বাসের সুরে পুনরুক্তি করলে আহমেদ, আরো জোরে চাপ দিলে তার গাঢ় রঙের আঙুল দিয়ে।

'হাত ছাড়ো,' বলে ইভদোকিয়া এমন দৃষ্টিতে তাকালে যে আপনা থেকেই মুঠো খুলে এল আহমেদের। সে দৃষ্টি উদাসীন, সুদূর, কেমন পর পর।

'আফসোস দুনিয়া,' ও বললে, 'ভারি মধুর ছিল আমাদের ভালোবাসা।'

'আমি যে এখন সংসারী। ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে।'

'ওতো পরের ছেলে!' বলে ইভদোকিয়ার মুখ দেখে মাঝপথে থেমে গেল আহমেদ।

'পরের ছেলে, কিন্তু তার জন্য কে দোষী?' বলে ও বালতি দোলাতে দোলাতে চলে গেল ওর কাছ থেকে।

আহমেদ আর পিছু ধরল না। সবই তো শেষ।

সেই দিনই সে চলে যায় শহর ছেড়ে।

১৪

হিসেব নিলে দেখা যাবে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সুখের চেয়ে দুঃখই মিলেছে বেশি...

স্কুল শেষ করে নাতালিয়া টেকনিকুমে ঢুকল, আর এমন অহঙ্কারী হয়ে উঠল — মা গো! গেরস্থালি কাজ সে একেবারে ছেড়ে দিল, মানে, মা নিজেই করবে; আর উনি নাতালিয়া বসে বসে জার্মান শিখবেন।

'এত কী দায় পড়েছে তোর?' জিজ্ঞেস করেছিল ইভদোকিয়া, 'টেকনিকুমেই তো তোদের জার্মান শেখায়।'

'শেখায়, কী হল তাতে?'

'হবে আর কী! শিখে শিখে তো হাড় মাস কালি করলি...'

ধৈর্য ধরে নাতালিয়া বোঝালে: টেকনিকুমে যা শেখায় সেটা যথেষ্ট নয়; খুব ভালো করে ওর জার্মান শেখা দরকার, টেকনিকাল বইপত্তর পত্রিকা সব পড়তে পারা চাই।

'এমনি তো সারা দিন বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকিস, তাতেও হবে না...'

ইভদোকিয়া বললে আর জবাব পেলে:

'মা, তুমি কিছু বোঝো না!'

পাভেল একটা ছবি এঁকেছিল: বাদামী ঘাস, সবুজ আকাশ, আকাশে লম্বা বেগুনি মেঘ। ইভদোকিয়ার সন্দেহ হল:

'আকাশ আবার সবুজ হয় নাকি রে!'

'হয়।'

'হয়, কিন্তু অমন কক্ষনো না। তোর একেবারে জ্বলজ্বল করছে।'

পাভেল বললে, 'তুমি বোঝো না।' তারপর শোনালে, আঁকার মাস্টার ছবিটার তারিফ করেছে, কী একটা প্রদর্শনীর জন্য ওটাকে মনোনীত করেছে। দাঁড়াল যে ইভদোকিয়া সত্যিই কিছু বোঝেনি।

রাস্তায় সমবয়সীদের সঙ্গে মারামারি করত কাতিয়া, আর মায়েরা এসে নালিশ করত, বকাবকি করত ইভদোকিয়াকে—কেন ও লাই দেয় কাতিয়াকে? মেজাজ খারাপ হয়ে যেত ইভদোকিয়ার দুগাল ওর লাল হয়ে গরম হয়ে উঠত, সজোরে ও পক্ষ নিত কাতিয়ার:

'একলা বুঝি ওরই দোষ? সব ছেলেমেয়েই মারামারি করে। আর তোরটা বুঝি শুধু দেখছিল? ধরে শোধ দিতে পারল না? ব্যাটা ছেলে, সে আবার নালিশ করে কবে?'

মায়েরা চলে গেলে ধমকের সুরে বলত:

'দেখলি তো, কী যে হাঙ্গামা করে বেড়াস কাতিয়া! সবাই আমাদের গাল দিচ্ছে — সে কি ভালো?'

মুখ খারাপ করে গালমন্দ করা ছেলেমেয়েদের মানা ছিল। তার জন্য চড়চাপড়েও কসুর করত না ইভদোকিয়া। তা সত্ত্বেও মুখ খারাপ করত ওরা। পাভেল একদিন ছবি আঁকতে আঁকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, টেবিলের ওপর অসমাপ্ত ছবিটা আর পেনসিলগুলো পড়ে ছিল। কাতিয়া এসে চেয়ারের ওপর চড়ে বসল, লাল পেনসিল দিয়ে আঁকিবুঁকি টেনে সারা ছবিটাকে ধ্যাবড়া করে দিলে। করলে রাগ করে নয়, ছবিটা আরো সুন্দর হবে এই ভেবে। পাভেল এসে ব্যাপার দেখে আস্তে করে বললে, ইভদোকিয়া যাতে শুনতে না পায়:

'তুই একটা শুয়োর!'

আর ছোট্ট কাতিয়া, পাছে পেনসিলটা আগেই কেড়ে নেয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি করে ফাঁকা জায়গাটায় পেনসিল চালাতে চালাতে জবাব দিলে:

'তুই নিজেই একটা শুয়োর!'

১৫

নাতালিয়া রাত্রে শুত বিচালি-ঘরে। বেশ লাগত তার, জানলায় চাঁদের আলো, ঠাণ্ডা বিচালি থেকে খাসা একটা গন্ধ, কেউ বাধা দেবার নেই — অবাধে স্বপ্ন দেখা যায় ভবিষ্যতের।

যাতে ঘুম না আসে, অনেকখন ধরে ভাবনা করা যায় তাই রাত্রে ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে মই বেয়ে সে উঠল; জ্যোৎস্নাভরা জানলার কাছে চোখে পড়ল একটা কালো মূর্তি, মুখে সিগারেট। পাভেলকে চিনতে পেরে চটে উঠল নাতালিয়া:

'মাথা খারাপ হয়েছে তোর, সিগারেট খাচ্ছিস বিচালি-ঘরে!'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে পাভেল:

'আঙুলে চেপে নিভিয়ে দেব।' চাপ দিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলে ও।

তারপর বললে, 'খাতা কেনার টাকা আমি খরচ করে ফেলেছি নাতাশা, আমি একটা নচ্ছার।'

'সে কী! বাজে কথা! হতে পারে না।' নাতাশা বললে।

পাভেল আহত হল:

'বলছি তোকে, খরচ করে ফেলেছি, তুই একেবারে...'

নাতাশা নজর করে দেখলে। ওকে "আপনি" বলে ডাকত, ছোট্ট ছিল, সে কতদিনই বা! আর এখন, তহবিল তছরূপ করেছে! সিগারেট খাচ্ছে...

ব্যাপারটা ও খুলে বললে। খাতা কেনার টাকা তোলার জিম্মাদারি দেওয়া হয় ওকে। ও টাকা তুলে ভেবেছিল অলগা ইভান্নাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু অলগা ইভান্না ছিলেন না, পরের দিন দিতে হবে। ও স্কুল থেকে বেরিয়ে যায় কাগজের দোকানে পেনসিল কিনতে। দোকানে সেই সময়ই আসে আলেক্সান্দরী

কাগজ আর ভালো জাতের রঙ। আলেক্সান্দরী কাগজ আর এই রঙ জোগাড় করা ভয়ংকর কঠিন, একদিনের মধ্যেই সব ফুরিয়ে যাবে। তাই ও রঙ কাগজ কিনে বসে। পরের দিন আর স্কুলে যায় না, স্কুলের ছুটির ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে আর ভাবে, কোথা থেকে টাকাটা জোগাড় করবে। পুরনো বইয়ের দামে ওর পাঠ্য বই বেচে দেয়, কিন্তু তার জন্য দেয় ওকে ভারি কম — দেড় রুবল। সঙ্গীসাথী সকলের কাছেই যায়, ধার চায়, কিন্তু সব মিলিয়ে জোটে মাত্র এক রুবল ষাট কোপেক।

'কত খরচ করেছিস তুই?' জিজ্ঞেস করলে নাতালিয়া।

'ষোলো রুবল।'

টাকাটার পরিমাণ দেখে চুপ করে গেল নাতালিয়া।

'এ নিয়ে মা-বাপের কাছে আমি যেতে পারি না, বুঝেছিস নাতাশা। জানি, ওরা দিয়ে দেবে, কিন্তু আমি পারি না, বুঝেছিস? আমি একটা নচ্ছার এ কথা ওরা জানবে, এ আমি সইতে পারি না। যা দেখছি, তাতে আত্মহত্যা করাই আমার পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গল। কী করে যে ঘটে গেল ব্যাপারটা, বুঝতে পারছি না, কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায় — তাহলে বাঁচব কেমন করে? কিন্তু মরতে আমি চাই না, এইটে সবচেয়ে জঘন্য ...'

একেবারে বড়ো হয়ে উঠেছে ও, সুন্দরই দেখায় ওকে — কী বুদ্ধিমান ওর কপাল, কী আবেগ ওর স্বরে। আর ও কিনা বলে মৃত্যুর কথা! দিদির স্নেহ জেগে উঠল নাতালিয়ার মধ্যে,

ভয় হল ওর জন্য। চুপ করে রইল সে, কথা বলতে গেলে পাছে গলা কেঁপে যায় এই ভয়ে।

‘আচ্ছা লোক তুই নাতাশা,’ ও বললে ব্যথিত আহত স্বরে, ‘আমি তোকে সব বললাম, আর তুই একটা কথাও বললি না। আচ্ছা লোক!..’

যাবার উপক্রম করলে ও।

‘দাঁড়া পাশা,’ নাতালিয়া বললে, ‘দাঁড়া। আমার মনে হয়,’ ও বললে ধীরে ধীরে, ‘মনে হয়, তুই এখনো নচ্ছার হয়ে উঠিসনি। বুঝেছিস? একেবারে নচ্ছার তুই নোস, কারণ তুই বুঝতে পারছিস, কী নচ্ছারি তুই করেছিস... আমার কাছে বারো রুবল আছে,’ সাহায্য করতে পারছে এই আনন্দে বলে গেল নাতালিয়া, ‘স্টাইপেণ্ড পেয়েছি। তোরও কিছু টাকা আছে। আমি আরো কিছু জোগাড় করব। কাল টাকাটা তুই দিয়ে দিবি। আর কাউকে বলিস না, শুনছিস? আমরা কাউকে বলব না। কিন্তু মনে রাখিস পাশা, যদি আর একবারের জন্যও, এতটুকুও এমন কাজ করিস, তাহলে সবার আগে আমিই গিয়েই স্কুলের সবাইকে বলে দেব।’

‘আচ্ছা লোক তুই!’ চেঁচিয়ে উঠল পাভেল, ‘ফের কখনো কেউ করে? তাই ভেবেছিস... আমি প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিলাম নাতাশা, কামা’র জলে গিয়ে ডুবব। তোর সঙ্গে শুধু একটু কথা কয়ে দেখছিলাম, তুই এটা জেনে রাখ।’

ও কেঁদে ফেললে, আর সেই সঙ্গে লজ্জায় মরে গেল

কাঁদছে বলে। নাতালিয়া ভাব করলে যেন এটা ওর নজরেই পড়েনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখতে লাগল কেমন করে আলোঢালা জানলায় ভেসে চলেছে রূপোলি মেঘ, আর গোপনে ঢোক গিলে নিলে তার গাল বেয়ে নামা হালকা অশ্রুজলটুকু।

'এইখানেই শো,' ও বললে পরে, 'এখানে ঘুমতে ভারি আরাম, পাশা।'

চোখের জলে, বুকের তোলপাড়ে ক্লান্ত হয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল বিচালির স্তূপের উপর। আর জানলায় সারা রাত ধরে ভেসে ভেসে গেল রূপোলি মেঘ।.

১৬

টেকনিকুমে ছুটির পর প্রতিদিন নাতালিয়াকে এগিয়ে দিতে শুরু করলে একটি তরুণ, মিষ্টি চেহারা। ইভদোকিয়ার চোখে পড়েছিল দুবার। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নাতালিয়া, স্বাধীনা কঠোরা, ছেলেটা তার হাতখানা ধরারও সাহস পাচ্ছে না, ব্যবধান বজায় রেখে আলাদা হয়ে হাঁটছে। দুবারই ভারি উৎসাহে হাত নেড়ে কী যেন শোনাচ্ছিল নাতালিয়াকে, উত্তেজনায় মাথার টুপিটা খুলে লোফালুফি করলে। ছেলেটাকে বেশ লাগল ইভদোকিয়ার, ভারি কচি, অমায়িক। নাতালিয়ার কথা ভেবে আনন্দ হল তার, এইত তাহলে ভগবানের কৃপায় প্রেম এল নাতালিয়ার জীবনে। কোনোরকম চপলতা ছিল না নাতালিয়ার

মধ্যে; মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করবে এটা ইভদোকিয়াও চাইত না; খাঁটি ভোজ দেওয়া এক বিয়ে — সেই তো ভালো।

নাতালিয়ার ওপর স্নেহ ওর আরো বেড়ে গেল, চাইত নাতালিয়া যেন তার অভিজ্ঞতা অকুণ্ঠে গল্প করে তার কাছে। নজর করে সে দেখত নাতালিয়াকে, বসে বসে ভাবছে নাকি, ছটফট করছে নাকি... ভাবত নাতালিয়া প্রায়ই, কিন্তু ছটফট করত না, নিজের গোপন কথাও কিছু জানাত না, নিত্যকারের মতো টেকনিকুমে যেত আর জার্মান ভাষা শিখত।

একদিন, নাতালিয়া ঘরে নেই, ঘণ্টি বাজল — সেই ছেলেটি, হাতে তার কাগজের মোড়ক, তাতে ফুল। বললে:

'দয়া করে এটি নাতালিয়াকে দেবেন।'

বলেই প্রায় ছুটে পালাল। ফুলদানি থেকে কাগজের ফুলগুলো তুলে নিয়ে সেখানে জীবন্ত ফুলগুলো রাখলে ইভদোকিয়া। ছোটো ছোটো নরম শাদা ক্রিসানথিমাসে ঘরখানা ভারি প্রসন্ন হয়ে উঠল... ভাবলে, "নাতাশা ভাগ্যবতী, আমি কোনোদিন কারো কাছ থেকে ফুল উপহার পাইনি।"

নাতালিয়া আসতে ইভদোকিয়া বললে:

'দেখগো তোর বর তোর জন্য কী দিয়ে গেছে!'

অবাক হল নাতালিয়া:

'বর আবার কে,' তারপর হাসল, 'ও এতো ভোভকা!.. বর কোথায়, কী যে বলো তুমি মা!'

'নয়ত কী,' ইভদোকিয়া বললে, 'এখন অবিশ্যি তোদের

রেজিস্ট্রি করবে না, এখনো তো তোর আঠারো হয়নি। বছর খানেক অপেক্ষা করা যায়। ছেলেটি দেখতে বেশ।'

'রেজেস্ট্রি ফেজিস্ট্রি কিছু হবে না, বছর খানেক বাদেও নয়, বছর পাঁচেক বাদেও নয়। ও আমার কমরেড মা, শুধু কমরেড।'

ইভদোকিয়া আহত হল।

'তুই ভারি চাপা, নাতালিয়া, বুঝলি,' ও বললে, 'বোকা পেয়েছিস আমায়? কমরেড আবার ফুলের তোড়া আনে কবে? দেখিস তো নি, কী করে যে ছুটে পালাল, জুতোর হিল খসে যায়নি এই ভাগ্য। ভালোবাসা নেই, শুধুই কমরেডি বন্ধুত্ব — ওসব কথা আর আমায় বলতে আসিস না।'

'বেশ, তর্ক করব না, হয়ত হবে,' বলে নাতালিয়া ঘুরে গিয়ে ক্রিসানথিমাসের গন্ধ শুঁকতে শুরু করলে, যদিও জানা কথা যে ও ফুলের গন্ধ নেই, 'আর জুতোর হিল খসে গেলেই যে লোককে ভালোবাসতে হবে, তার কী মানে আছে! এটা কিছু সিরিয়স নয়। মাপ কোরো মা,' ও শেষ করলে ভ্রূকুটি করে, রেঙে ওঠা মুখখানা ফুলদলে ঢেকে, 'এ নিয়ে কথা কইতে ভালো লাগে না আমার, মাপ করো।'

কথা তো নয় যেন ছুরি। অমন খাসা ছেলে, কী সুন্দর তোড়া, মিষ্টি নাম — ভোভা, আর ওনার কিনা কথা কইতেও ভালো লাগে না, দেখ একবার। কীসে মন উঠবে মেয়ের? একটু বাড়াবাড়ি রকমের আশাই করছে না কি, কপালে শেষে অনেক

দুঃখই হয়ত বা আছে। "না, না, তা যেন না হয়! সুখী হোক! বাসনা ওর পূর্ণ হোক, সবকিছুই কুশল হোক আমার মেয়ের।"

১৭

প্রথম পাঁচসালার প্রথম বছর সেটা। কারখানা থেকে আন্দ্রেই একদিন বাড়ি ফিরল না।

ওর জন্য অপেক্ষা করে করে রাতের খাওয়া সারা হল ওকে বাদ দিয়েই। আগেও এমন ব্যাপার হয়েছে দেরি করে এসেছে ও, আড্ডা দিয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু কী একটা যেন অস্বাভাবিক, অপরিসীম দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল ইভদোকিয়াকে, ইভদোকিমকেও সে চিন্তিত করে তুললে।

বসে রইল দুজনে, কান পেয়ে রইল অপেক্ষায়। গুমোট করেছিল; বাতির পাশে গুনগুন করছে মশা... রাতে বাজ ডেকে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির পর ইভদোকিম জানলা খুলে দিলে, তাজা সোঁদা হাওয়ায় ঘর ভরে গেল, রাস্তায় শোনা যাচ্ছিল জলস্রোতের কল্লোল, আকাশ ফরসা হয়ে এল... হঠাৎ দরজায় করাঘাত বাজল। লাফিয়ে উঠল ইভদোকিয়া, ইভদোকিম ওকে যেতে দিলে না। বললে:

'তুমি যেয়ো না, আমি যাচ্ছি।'

ভারি পায়ে ও গেল দরজা খুলতে, পেছন পেছন ইভদোকিয়া, উঁকি দিয়ে দেখলে ওর পেছন থেকে। রাস্তার

জলকাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একদল ছেলে। ছেলেগুলোর মুখে কথা নেই, ইভদোকিমও চুপ করে রইল। ওদের মধ্যে একটি ছোকরা, পরনের ট্রাউজারটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা, রাস্তার জলের মধ্যে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এল। বললে:

'খারাপ খবর, ইভদোকিম নিকলাইচ্।'

'বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম।

ফের চুপ করে রইল ছেলেগুলো, ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে উঠল আকাশ, কুলকুল করে বইছিল জলস্রোত...

আন্দ্রেই কফিনে শুয়ে, কী বড়ো কফিনটা, যেন সোমত্ত মরদের জন্য তৈরী! ওর মাথা বলতে যেটুকু ছিল তা মসলিন আর ফুলে ঢাকা। ইভদোকিয়া ওর শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল, কী হয়েছে কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না তার।

কারখানার ছুটির পর ক্রুজিলিখা থেকে ট্রেনে ও ফিরছিল — মানে হ্যাঁ, রোজ যেমন ফেরে। বন্ধুবান্ধবরাও সঙ্গে ছিল। লাফ দিয়ে ও প্রথম নামে। হঠকারিতাই হয়েছিল। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রেলের ওপর... ওকে তুলে দেখা গেল মাথার খুলি ভেঙে গেছে, অ্যাম্বুলেন্স আসে, ডাক্তার বলে ও মারা গেছে, কিন্তু সঙ্গে যে ছেলেগুলো ছিল তাদের বিশ্বাস হয়নি। ওরা কমসোমল কমিটিতে আর অভিশংসকের কাছে ফোন করে, দাবি করে, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে। শেষপর্যন্ত মর্গে ওর শিটিয়ে যাওয়া নিথর দেহটা দেখার পরেই মাত্র ওরা বোঝে, চিকিৎসা অচল। সারা রাত ওরা ঝড়বৃষ্টির

মধ্যে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে আর তর্ক করেছে, কে একথা বলতে যাবে ওর মা বাপের কাছে। কেউ যেতে রাজী নয়, শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় সবাই মিলেই চলুক।

ও শুয়ে ছিল দীর্ঘ, অপরিচিত, একেবারে সাবালক মরদের মতো, বয়স্করাও ওর সম্পর্কে কথা কইলে সমান সমানের মতো। ওকে কবর দেওয়া হল কারখানা থেকে, শবযাত্রায় যোগ দিলে সেকেলে ফ্যাশনের কোট পরা বুড়োরা, মালা হাতে মেয়েরা, লাল টাই বাঁধা বাচ্চারা। অর্কেস্ট্রা বাজল, ভারি জমকালো পতাকা বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল শেস্তেরকিন, আর চোখের জলে বুক ভাসালে কাতিয়া।

লোকজনের সামনে ইভদোকিয়া প্রায় কাঁদলে না। আস্তে আস্তে সান্ত্বনা দিলে শেস্তেরকিনকে, কাতিয়াকে বোঝালে। কিন্তু বাড়ি ফিরে চেয়ারের পিঠে আন্দ্রেইয়ের পুরনো কোট আর তার পকেট থেকে মুখ বার করা দাঁতে কামড়ানো পেন্সিলটা দেখে হঠাৎ টেবিলের ওপর মাথা ঠুকে গোঙাতে লাগল, কাঁদতে লাগল ...

অনেক অনেক দিন ধরে আন্দ্রেইয়ের জিনিসপত্রগুলো ওকে কষ্ট দিয়েছে, আর কেবলি যেন তার কানে বেজেছে অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীতটা, ঝাঁঝরের নির্মম ঝনৎকার। আর সবচেয়ে বেশি করে বুক তার ছিঁড়ে গেছে স্মৃতিতে, যখনই মনে পড়েছে সেই দিনটির কথা, ইভদোকিম নিয়ে এল ওকে, বললে ধুইয়ে দিতে, আর তার কালো রক্তমাখা অমানুষিক মুখটার জায়গায় ফুটে উঠল ফরসা জ্বলজ্বলে একটি শিশুর মুখ ...

হয়ত বা তারই দোষ? সব কিছু কেন সে নজর করে দেখেনি? আগে থেকেই আন্দাজ করে সব কিছু ও কেন করেনি, কেন ওকে বলে দেয়নি, তাহলে হয়ত বা এটা ঘটত না, সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকত আন্দ্রেই। কেন সে এমন কথা বলেনি, এমন হুঁশিয়ারি দেয়নি, যাতে বেঁচে যেত ছেলেটা?

সময় থাকতে ভাবেনি সে, অবহেলা করেছে, ঘটতে দিয়েছে। এখন যে আর পার নেই।

১৮

কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল ইভদোকিয়া, সঙ্গে নিয়েছিল সাশেঙকাকে। ঘণ্টা খানেকের জন্যও ওকে ছেড়ে থাকতে পারত না সে — বড়ো হয়ে এমন স্বাধীন আর দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা। ইভদোকিয়ার সারা দিন সারা রাত একটু স্থির হয়ে বসার উপায় ছিল না ওর জন্য। তাছাড়া সুন্দর হয়ে উঠেছিল অসাধারণ; ইভদোকিয়ার মনে হত অমন সুন্দর ছেলে আর কারো নেই; ভয় হত, কেউ না ওকে চুরি করে নিয়ে যায়।

জুতোর দোকান, কাপড়ের দোকানে অনেকক্ষণ ঘুরল ওরা, পরে গেল বিস্কুটখানায়, কেক কিনল। কেকের শাঁসটুকু খেল সাশেংকা, ক্রিমটা খেতে চাইল না, সেটা খেলে ইভদোকিয়া। তারপর দাঁড়িপাল্লায় নিজের ওজন নিল, সিরাপজল খেল, কেনা হল একটা নীল ফ্ল্যানেলের ভালুক, চোখের জায়গায় তার দুটো

বোতাম বসানো। ভাল্‌কটা বইতে সাশেঙ্কার ইচ্ছে ছিল না, বইতে হল ইভদোকিয়াকে। বাড়ি ফিরল ক্লান্ত হয়ে। সাশা যেমন ছিল, তেমনি পোষাক-আশাক পরেই সটান ইভদোকিয়ার বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ইভদোকিয়া ওর জুতো খুলে, মাথার নিচে বালিশ ঠেলে দিয়ে গেল রান্না দেখতে। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল, সেই মেয়েটি এসে ঢুকল।

আজ আর বব চুলে ঢেউ খেলানো নেই, নেই উঁচু হিলের জুতো। দীন ভাবে সে এল, খৃষ্টের নামে কৃপাভিক্ষা করলে। ইভদোকিয়া তাকে দোরগোড়ায় বসালে, এক গেলাস দুধ আর একটা শানগা এগিয়ে দিলে। মেয়েটার কিন্তু কোনো তাড়াহুড়া দেখা গেল না, মনে হল না ক্ষুধার্ত — মোটা মোটা, লালচে গাল, শুধু বেশভূষা জীর্ণ, মলিন। চুল্লির সামনে এটা ওটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল ইভদোকিয়া। জিজ্ঞেস করলে:

'জোয়ান বয়েস, ভালো স্বাস্থ্য, কাজ করিস না কেন?'

মেয়েটা বিব্রত বোধ করল না:

'তুমিও তো কাজ করো না।'

'আমার বাছা পাঁচটা লোকের রান্না বান্না, ধোয়ামোছা, সেলাই ফোঁড়াই। আমার ন্যায্য কারণ আছে। চারটি ছেলে মেয়ে আমার, তাছাড়া স্বামী।'

'ও তো আর তোমার ছেলে মেয়ে নয়,' বিদ্রূপ করে হাসল মেয়েটা।

হাতের চিমটে থেকে গেল ইভদোকিয়ার:

'বটে? তা নাই বা হল আমার ছেলে?'

'পোষ্য নেওয়া ছেলে,' বললে মেয়েটা, 'পেটে ধরল অন্যে, বিয়ল অন্যে, আর মা বলে ডাকে তোমায়।' দুধের গেলাসটা এক ঢোকে খেয়ে শেষ করলে ও, ঠকাম করে খালি গেলাসটা সিন্দুকের ওপর রেখে চেঁচাল ও, 'তুই আর কী করলি? ওদের জন্য যন্ত্রণা আর কী সইলি? শানগা গেলাতে আসিস!' শানগাটা ও ছুড়ে ফেলে দিলে ইভদোকিয়ার পায়ের নিচে, একটা ছেঁড়া রুমাল বার করে ওয়াক ওয়াক করলে, আর এতক্ষণে ইভদোকিয়া বুঝলে ও মাতাল। 'ইস, কী আমার বুদ্ধি! একশ রুবল তো আগে বার কর, নেব কি নেব না পরে দেখা যাবে!'

'একশ রুবল কিসের জন্য?' অবাক হয়ে গেল ইভদোকিয়া।

'আ মর!' সরু গলায় চেঁচাল মেয়েটা, 'কী ভালোমানুষের মেয়ে একবার তাকিয়ে দেখো ওনার দিকে! একশ রুবল ফ্যাল নয়ত ছেলে আমার ফেরত দে, শুনছিস? পাঁচ বছর ধরে ছেলেটিকে আমার নিয়ে রেখেছিস, আর আমায় ঠেলে দিস শানগা! দেখো একবার!'

চিমটি রেখে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললে ইভদোকিয়া।

'ছেলে নিয়ে যাব, আর কখনো দেখতে পাবি না, ওর জন্মের সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে।' মেয়েটা চ্যাঁচালে।

ইভদোকিয়া বললে, 'তোর কোনো স্বত্ব নেই, ভবঘুরে মাগী, কেউ তোকে ছেলে ফেরত দেবে না।'

'দেখব কেমন না দিস।'

'তুই ওকে ফেলে দিয়েছিস!'

'ছেঁদো কথা রাখ! হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি তখনো সামলে উঠিনি; সিঁড়ির ওপর ওকে রেখে আমি ফটকের ওধারে একটু পেচ্ছাব ফিরতে গেছি; এসে দেখি ছেলে আর নেই ...'

'মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী কোথাকার, তুই ওকে ফেলে দিয়েছিলি!'

'তুই নিজে মিথ্যেবাদী। তুই ওকে চুরি করেছিস! ওর জন্মের সার্টিফিকেট আমার কাছে, সাক্ষীসাবুদ আনব, মামলায় দেখিয়ে দেব, ও আমার ছেলে! তুই তো বাঁজা — পরের ছেলে পালিস যাতে কাজ করতে না হয়, বেশ বসে থাকা যায় উনুনের ধারে। আমাদের প্রলেতারীয় আদালতে সত্যেরই জয় হবে!' বিজয়িনীর মতো গর্জন করে বলল মেয়েটা, 'পরগাছা কোথাকার, আদালতে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ছাড়বে!..'

এই সময় পাভেল ফিরল স্কুল থেকে; ঝগড়া চেঁচামেচি কানে আসতে অবাক হয়ে থমকে গেল সে।

ইভদোকিয়া বললে, 'পাশা, এখানে দাঁড়া, কোথাও যাবি না।' বলে নিজে গেল শোবার ঘরে। সুখে ঘুমচ্ছে সাশেঙ্কা, কচি মুখখানা একটু হাঁ করা। ওর ইজের আর টান টান মোজার ফাঁকে অনাবৃত হয়ে আছে তার গাঢ় রঙের আঁটসাঁট দেহাংশ। নীল ভালুকটা পাশেই শুয়ে।

ও চলে যাবে ঐ মাতাল মাগীটার সঙ্গে, সে ওকে ভিক্ষে করতে পাঠাবে, মারধর করবে তা ভাবতেই ভয়ঙ্কর মনে হল... হাঁটু গেড়ে বসে ইভদোকিয়া সিন্দুক খুললে। সিন্দুকের একেবারে তলে রেশমী রুমালে বাঁধা টাকা — এটি ও জমাচ্ছিল ইভদোকিমের স্যুটের জন্য। নাতালিয়ার যখন বিয়ে হবে তখন তো ইভদোকিমের একজোড়া নতুন স্যুট চাই-ই। পুরনোটায় আর চলে না। স্বামীকে লুকিয়ে ইভদোকিয়া দুধ বেচে টাকাটা জমায়। একশ রুবল গুণে নিয়ে সে ফিরে এল রান্নাঘরে। বলল:

'নে, রসিদ লিখে দে! পাশা, ওকে দোয়াত দে তো, সোনা।'

টাকা দেখে দরদ উঠল মেয়েটার। কলম নিয়ে আপোষের সুরে বললে:

'লেখাপড়া তো বিশেষ জানি না।'

কী লেখে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে পাভেল আর ইভদোকিয়া।

কর্তৃত্বের সুরে ইভদোকিয়া বললে:

'আর লেখ, তুই ওর সব দাবি ছেড়ে দিচ্ছিস, তুই ওর মা নোস, ডাইনি।'

মেয়েটা সই করলে, "ইতি আন্না শ্কাপিদার", নাম সইয়ের শেষে টান জুড়লে একটা জুতসই। ইভদোকিয়া রসিদ নিয়ে সেটা লুকিয়ে রাখল সিন্দুকের একেবারে তলে, রেশমী রুমালটায়।

১৯

টেকনিকুম শেষ করে নাতালিয়া ইনস্ট্রুমেণ্ট কারখানায় কাজ করছিল। ভেবেছিল বছর তিন চার কাজ করবে পরে আরো পড়বে, ইনস্টিটিউটে। কিন্তু হঠাৎ ইচ্ছে পালটে আমুর তীরের শহর গড়ার দলে নাম লেখালে।

নাতালিয়ার এ যাত্রায় দুঃখ হয়েছিল ইভদোকিয়ার। বললে, 'রইল পড়ে ভাষা শেখা, ইংরেজি নিয়ে, জার্মান নিয়ে কষ্ট করা খুব হল, এখন গিয়ে গাছের মোথা তোলা আর ইঁট বসানো।'

এতে কেবল হাসল নাতালিয়া। কমসোমল দলের সঙ্গে চলে গেল, ভগবান জানেন কত দূরে।

পাভেল চেয়েছিল শিল্পী হবে।

মা-বাপ সঙ্গীসাথীর সঙ্গে কোনো পরামর্শ করলে না সে, ওর মনে হয়েছিল এ কথা শুনে ওরা হাসবে; নিজের পরিকল্পনার কথা বললে কেবল ড্রইং মাস্টার নিকলাই ল্ভভিচ্‌কে।

লোকটা বুড়ো, বাচ্চাদের মতো কী একটা কোর্তা গায়ে দিতেন আর মোচখানা যেন আতোস-পোর্তোস-আরামিস'এর মতো। ছাত্রদের সঙ্গে ওঁর কথাবার্তার ধরনে ভর্ৎসনা শুনতে হত ওঁকে, এমন কি কর্মচ্যুতির হুমকিও বাদ যায়নি।

অসফল কোনো একটা আঁকা দেখলে উনি আচমকা খেঁকিয়ে

উঠতেন, 'উঃ, কী এঁকেছিস এটা? কী হয়েছে এই জরদ্গব মূর্তিটা? বলতে চাস কী?'

শিল্প সম্বন্ধে বলতেন:

'মনে রাখিস, শিল্পীর প্রথম হাতিয়ার হল তার চোখ; তুলি পেনসিলটা পরে। অপলকে তাকিয়ে দেখতে শেখ। একটা পাতা নিয়ে রোদ্দুরে নজর করে দেখ। পাতার প্রতিটি শিরা উপশিরা মনে করে রাখ — প্রতিটি পাতাই অদ্বিতীয়। ফোটোগ্রাফি করবি না কখনো। ন্যাচারালিস্ট, ফোটোগ্রাফার, নিসর্গের হতভাগা নকলনাবিশ সব — গুলি করে মারা উচিত এদের। ফোটোগ্রাফের মতো করবি না, কিন্তু গড়নের সবকিছু খুঁটিনাটিটা ভালো করে ধরতে শেখ, তবেই তাকে অমর করে দিতে পারবি। এই যে পাতাটা তুই দেখলি, পর্যবেক্ষণ করলি — এটা শুকিয়ে যাবে, পচে যাবে। কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি-করা পাতা কখনো শুকোয় না, মরে না, এ পাতা চিরকালের। মেরী মাতা অমর কিনা, বাস্তব কিনা তাতে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু রাফায়েলের মেরি মাতা বাস্তব, চিরন্তন। স্রষ্টা হতে হবে! অস্বীকার কর মৃত্যুকে! অন্ধকারকে আলো থেকে তফাৎ করে তোল, তরলকে কঠিন থেকে পৃথক করে দে! আর যদি তা না পারিস, তবে ভিস্তিওয়ালা হগে যা।'

আরো বলতেন:

'সৌন্দর্য, সেটা কী? বলে, চিকন চিকুর — এটা সুন্দর, টেকো মাথা কদর্য। আমি বলি — টাক চমৎকার! মাথার প্রসন্ন

ঢোল ফুটিয়ে তোলে তা। মানুষের ললাটের গৌরব ও মেধা অবারিত করে তা। (জরদ্‌গবের টাকের কথা অবিশ্যি বলছি না।) শুধু সেইটে চমৎকার যা চিন্তাগর্ভ। রূপের কপালে ঝাঁটা মারি — ভাবনাকে ঝাপসা করে দেয় তা। চিন্তা নেই এমন রূপের সবচেয়ে সুন্দর ছবির জায়গা কেবল পাইখানায়।'

'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই সুরে কথা বলা কি সাজে?' রেগে উঠতেন শিক্ষাচার্যেরা। নিকলাই ল্‌ভভিচ উত্তর দিতেন:

'ওরা বোঝে। আর যার মাথায় মগজের বদলে মুরগীর নাড়িভূঁড়ি আছে তার বোঝার দরকার নেই।'

আর সত্যিই ছাত্ররা ওঁকে বুঝত, মাস্টার যে ওদের সঙ্গে এইসব কথা বলছেন, তাতে গর্বই হত তাদের; অনেকের কাছেই ড্রইংয়ের ক্লাসটা ছিল সবচেয়ে প্রিয়।

নিজের পরিকল্পনার কথা পাভেল জানাল এই পাগলাটে লোকটার কাছেই। শুনে নিকলাই ল্‌ভভিচ যেন একেবারে মামুলী একটা জিনিসের কথা হচ্ছে এইভাব করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন:

'বেশ তো, স্কুল শেষ কর, তারপর পড়তে যাস শিল্প আকাদমিতে।'

'নিকলাই ল্‌ভভিচ, আপনার কি মনে হয়, স্রষ্টা হতে পারব আমি?' স্পন্দিত বুকে জিজ্ঞেস করলে পাভেল। নিকলাই ল্‌ভভিচ মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন:

'পারবি।'

আনন্দে লাল হয়ে পাভেল বললে:

'কিছু একটা আঁকতে দিন আমায়।'

'আঁকতে দেব?'

নিকলাই ল্ভভিচ ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন:

'তোর বাপ ক্রুজিলিখায় কাজ করে?'

'করে।'

'ক্রুজিলিখায় গেছিস তুই?'

'কতো বার।'

'বেশ, তাহলে আমায় ক্রুজিলিখা এ'কে দেখা।'

কাজটা সহজ। ক্রুজিলিখায় গেল পাভেল, শেস্তের্‌কিনের বাড়ির ছাতে বসে বসে শহরটার স্কেচ করলে সে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে শেস্তেরকিন চ্যাঁচাল, 'আঁক, এ'কে যা, আঁক আমাদের মা ক্রুজিলিখাকে!'

বাড়িতে এসে স্কেচটার ওপর রঙ চড়ালে সে, সমস্ত চিমনি আর ধোঁয়া সে যথাযোগ্য ফুটিয়ে তুললে আর এফেক্টের জন্য আকাশে দিলে অস্তসূর্যের রঙ। ছবি শেষ করে সে ছুটল নিকলাই ল্ভভিচের কাছে।

ছবি দেখে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করলেন নিকলাই ল্ভভিচ, 'এটা কী আঁকা হয়েছে?'

পাভেলের কান ঠাণ্ডা হয়ে এল। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় সে বললে:

'ক্রুজিলিখা, আপনি বলেছিলেন...'

'আমি বলেছিলাম ক্রুজিলিখা, আর তুই এঁকেছিস কেবল কতকগুলো চিমনি।'

'এ তো ক্রুজিলিখারই চিমনি।'

'ঘোড়ার ডিম!' নিকলাই ল্ভভিচ বললেন, 'আর সূর্যাস্তটা কেন? সুন্দর দেখাবে বলে?'

ছবিটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।

'সূর্যাস্তের ক্রুজিলিখা, পূর্ণিমায়, শীতে, গ্রীষ্মে ক্রুজিলিখা — এ তো আরো ভালো করেই আমি দেখতে পারি যে কোনো ফোটোগ্রাফে।'

ছবিটা পাভেলের কাছে এখন কেমন কদর্য হয়ে উঠেছে; সেটিকে তুলে নিয়ে হেঁট মাথায় সে ফিরে গেল বিষণ্ণ মনে। কেমন করে সে ক্রুজিলিখাকে আঁকবে, যাতে তারিফ করবে নিকলাই ল্ভভিচ?

সারা শীত সে ক্রুজিলিখায় যাতায়াত করলে। একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে ভেবে শেস্তেরাকিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল: ঠাট্টার কথা নয়, কনকনে বাতাসে ছাতের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা! কলঘরগুলোতেও ঘুরলে পাভেল, দেখলে শতশত যন্ত্র আর জনতা... জোয়ান বুড়ো যারা কাজ করছে এসব মেসিনে। কলঘরগুলি সে আঁকল, আঁকল আর ছিঁড়ল: এতো ক্রুজিলিখা নয়! লেদ মেসিনগুলো সঠিক ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, লোকজনের চেহারা পোর্ট্রেটের মতো নিখুঁত; কিন্তু এতো কেবল যন্ত্র আর

মানুষ, ছবিতে ক্রুজিলিখা কোথায়? ক্লাসের কথা ভুলে গেল পাভেল, নাওয়া খাওয়া ভুলল, দিন কাটল কেবল যন্ত্রণায় আর জেদে। ক্রুজিলিখা আচ্ছন্ন করে তুলল তাকে। চিমনির পরিচিত আকৃতিগুলির প্রতিটি খুঁটিনাটি, কলঘরগুলির পরিপ্রেক্ষিত ঘুমের মধ্যে নাড়া দিত তাকে, বারম্বার পুনরাবৃত্তিতে ক্রুজিলিখা নামটাই যেন তার তাৎপর্য হারিয়ে অন্য কী একটা অর্থে ব্যঞ্জনাময় হয়ে দাঁড়াল। ক্রুজিলিখা... ক্রুজিলিখা... এ যেন একটা মেয়ের নাম। এ যেন স্তেপানিখা, কার্পিখা, চোর্নিশিখা, ক্রুজিলিখা...

হঠাৎ একটা সরল ভাবনা জেগে উঠল তার মনে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন অন্ধকার ঘরে কেউ সুইচ টিপেছে। হাত কাঁপল ওর, গলায় কী একটা দলা পাকিয়ে উঠল। কী সহজ, কী সরল!.. একটু বেশি রকমের সরল নয় তো? না, সুখের সমস্ত স্পন্দনে, হৃদয়ে হৃদয়ে সে জেনে গেছে, এই সরলই ভালো — ভালো, ভালো!

ক্রুজিলিখা — সে তো নারী, শ্রমিক নারী, কল্যাণী ও সবলা। ছবিটা তার যেন আঁকাই হয়ে গেছে এমন স্পষ্ট করে ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। এই তো ক্রুজিলিখা — তরুণী নয়, প্রবীণাও নয় — অবারিত তার ললাট, অর্ধস্ফুরিত চোখ, কর্মে নিবদ্ধ দৃষ্টি। কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হাতে হাতল ধরা, হাতের প্রতিটি পেশী সর্বশক্তিতে জীবন্ত। ক্রুজিলিখার এ হাতে দুনিয়ায় অসাধ্য কিছু নেই। তার জোরালো কাঁধে বইতে পারে

যে কোনো ভার। আর সে কাঁধের পেছনে রোদঢালা আকাশের পটে দেখা যায় ধূমায়িত চিমনি — ক্রুজিলিখার চিমনি!

প্রতিটি খুঁটিনাটি ওর চোখে ভেসে উঠল: সংসারের ভাবনায় তার গালের ওপর ভাঁজ পড়েছে, মাথায় বাঁধা রুমালের পাশ থেকে কুন্তল বেরিয়ে এসেছে, বুড়ো আঙুলের গোড়ায় কঠিন পেশী... এ নারী সুন্দরী নয়, সুন্দরের প্রত্যাশী নয়, কেউ তার কাছে সৌন্দর্য চাইবেও না... সে ক্রুজিলিখা!

বরফের ওপর দিয়ে নয়, যেন বাতাসে ভেসে পাভেল ফিরল ঘরে। ওর পায়ে যেন ভারি ফেল্ট-বুট নেই, নেই মুখ আঁচড়ানো তুহিন বাতাস, নেই পথচারী — কিছু নেই, শুধু সুখ। একছুটে যেন ও পেঁাছে গেল শেস্তেরকিনের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়িতে। কাগজ পেনসিল টেনে নিল ও, সাবধানে, অনিপুণ আঁচড়ে পাছে বা নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে ভয়ে ও ছকে তুলল সেইটে, যা সারা বিশ্ব ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের সামনে... তারপর ফের একছুটে তা নিয়ে হাজির হল নিকলাই ল্‌ভভিচের এলোমেলো আইবুড়ো ঘরখানায়, যেখানে ছেলেমানুষী কুর্তা গায়ে রুটিতে আপেলের জ্যাম মাখিয়ে চা খাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। নীরবে ঢুকে পাভেল ছবিটা রাখলে টেবিলের ওপর।

নিকলাই ল্‌ভভিচ চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কে এটি?'

'ক্রুজিলিখা,' পাভেল বললে।

যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ পায়ে মাটি ঠেকে ও

জেগে উঠল। ক্লান্তিতে ঠাণ্ডায় ভার-ভার লাগল দেহ, চিরকেলে ধূলিধূসর বাতিটা জ্বলছে, নিজের গলাটা শোনাল কেমন কর্কশ, ভাঙা ভাঙা।

অপেক্ষা করে রইল ও। নিকলাই ল্ভভিচ চেয়ে দেখে চুপ করে রইলেন। শিরদাঁড়া থেকে একটা শিউরানি উঠে বুকে গিয়ে ঠেকল পাভেলের। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল মুখে। "যদি উনি এবারও ধমক দেন তাহলে জীবনে আর কখনো কিছু আমি আঁকতে পারব না।" স্থির ঠাণ্ডা মনে বিনা যন্ত্রণায় ভাবলে পাভেল। হঠাৎ তার কানে এল একটা অদ্ভুত ক্যাঁক কেঁকে শব্দ। মুখ ফেরালেন নিকলাই ল্ভভিচ, বাঁকা পিঠটা কেঁপে উঠল।

'নিকলাই ল্ভভিচ, কী হল? নিকলাই ল্ভভিচ...' ভয় পেয়ে অস্ফুটে বলে উঠল পাভেল।

নিকলাই ল্ভভিচ গামছার মতো একটা প্রকাণ্ড রুমালে নাক ঝাড়া দিলেন।

বললেন: 'ও কিছু না চের্নিশোভ, কী জানিস — প্রতিভা এ অতি বিরল, অতি অপূর্ব, কাঁদিয়ে ছাড়ে রে...'

পরে ছবিটা সম্পর্কে বললেন:

'এখন ওটা শেষ করিস না। অমনি পড়ে থাক। সবুর কর, যতদিন না তোর ভাবনাটাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলার সামর্থ্য তোর হচ্ছে। তোর যা সে তো তোকে ছেড়ে পালাচ্ছে না, তা নিয়ে তাড়াহুড়া কেন? বড়ো শিল্পী হবি তুই।'

২০

ভারি নাবিক-ভক্ত হয়ে উঠল সাশেঙ্কা। যেসব বইয়ে জাহাজের ছবি আছে ঠিক সেগুলিকে চিনে বার করত সে। একবার কামা নদীতে স্টিমারের খালাসীদের দেখে সে একেবারে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা সমুদ্রে যায় না ইভদোকিমের কাছ থেকে একথা শুনে হতাশ হয়ে উঠল সে। কামার দিকে চেয়ে আহত স্বরে সে জিজ্ঞেস করলে:

'কেন নদীটা সমুদ্রে যায় না?'

ইভদোকিয়া বললে, 'আমি জানি না সোনা, বাবাকে শুধোস। যায় না যখন, তখন ওখানে ওর হয়ত দরকার নেই।'

ওর যখন সাত পূর্ণ হল তখন বসন্তের জন্য ওর একটা লম্বা প্যাণ্ট সহ নতুন স্যুট বানাতে শুরু করে ইভদোকিয়া। তাতে ভয়ানক আগ্রহ দেখা গেল সাশার, ঝোঁক ধরে কেঁদে কেটে সে ইভদোকিয়াকে রাজি করালে, খাঁটি নাবিকের মতো ট্রাউজার সহ জাহাজী সাজ করে দেবে তাকে।

যেদিন পোষাকটার শেষ ট্রায়াল দেবার কথা সেদিন এসে হাজির হল আন্না শ্কাপিদার, সাশার মা, তিনশ টাকা দাবি করলে। ইভদোকিয়া ক্ষেপে উঠে ভাগিয়ে দিলে ওকে, একটি কোপেকও দিলে না।

দু সপ্তাহ পরে ইভদোকিম ও ইভদোকিয়ার ডাক পড়ল জন আদালতে।

বিচারকের বয়স বেশি নয়। চুলের একেবারে কোনো রঙই নেই, কেমন নকল বলে মনে হয়, গলার স্বর ক্লান্ত, মুখ অপ্রসন্ন। বাদী প্রতিবাদীদের জেরা করছিলেন তিনি, বিব্রত কুঞ্চিত কপাল, কেন যে লোকগুলো বিবাদ করছে তা যেন ভেবেই পাচ্ছেন না। বিচারকের ডানে বাঁয়ে সহকারীরা: দশাসই একটি পুরুষ, হাসিহাসি মুখ, আর শক্তসমর্থ চুল পাকা একটি মেয়ে, গায়ে তার পুরুষালি ডাবল ব্রেস্ট কোট। এই মেয়েটিকে দেখেই বিশেষ ভরসা হল ইভদোকিয়ার।

প্রথমে মামলা চলল এক জোড়া স্বামী স্ত্রী নিয়ে — এরা পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে পারছে না; আর যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ তাও কেবল একটা লেখার টেবিল আর সেলাই কল। "আপনি কলে সেলাই করতে পারেন?" স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন বিচারক, কপালে তার পীড়িত কুঞ্চন। ঘরের মধ্যে হেসে উঠল সবাই; বিচারক ঘণ্টা বাজালেন।

এজমালি একটা বাসাবাড়ি থেকে দরোয়ান সত্যিই বাসিন্দাদের কাঠ চুরি করেছে কিনা এই নিয়ে একটা অশেষ বিসম্বাদ চলল পরে। পাশের কামরা থেকে বাসিন্দারা একে একে এসে দরোয়ান সম্পর্কে তাদের মত জানাতে গিয়ে সেই সঙ্গে অন্যান্য বাসিন্দাদের সম্পর্কেও দু চার কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল। বিচারক দুই হাতে মাথা ধরে কেবলি বলছিলেন: "এর সঙ্গে মামলার সম্পর্ক নেই, যা প্রশ্ন তার উত্তর দিন।" শুনতে শুনতে মাথা ধরে উঠল ইভদোকিয়ারও... হঠাৎ দুপদাপ করে পা ফেলে

বাসিন্দারা চলে গেল সবাই; হাঁক শোনা গেল: বেআইনীভাবে পরের ছেলেকে হস্তগত করার অভিযোগে স্বামী স্ত্রী চোর্নিশোভদের মামলার শুনানি উঠছে।

ইভদোকিম ও ইভদোকিয়া বিচারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আন্না শ্কাপিদারও গিয়ে দাঁড়াল একটু তফাতে। নেশা করেনি সে, মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। অনেকক্ষণ ধরে বিবরণ পেশ করলে সেক্রেটারি, আইনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করলে, এবং "বেআইনী হস্তগত" কথাটা এত বারবার ও এমন ভাব করে উচ্চারণ করলে যে ইভদোকিয়া একেবারে দমে গেল — এই বুঝি পড়া সাঙ্গ হবে আর বিচারক হুকুম করবে, কোন কথা শুনতে চাই না, সাশেঙ্কাকে ফিরিয়ে দাও আন্নার কাছে...

'কী উপাধি আপনার?' আন্নাকে জিজ্ঞেস করলেন বিচারক।

'শ্কাপিদার,' জবাব দিলে আন্না।

'সে কী করে হয়!' পীড়িত গলায় বললেন বিচারক, 'ওরকম উপাধি নেই। স্কাপিদার!' ভারিক্কি ভাবে জানিয়ে তিনি ফিরলেন ইভদোকিমের দিকে।

ইভদোকিয়া জানত, স্বামী তার বুদ্ধিমান, জীবনের ব্যাপারে খাঁটি কথাই সব বলে, — শুধু যদি একটু ভগবান আর সাধু সন্তদের ভক্তি করত তাহলে ইভদোকিয়া তার প্রতিটি কথাই একবাক্যে মেনে নিত। মামলাতেও ও এমন পরিষ্কার করে গুছিয়ে সব বললে যে চারিদিকে অচেনা লোক সব না থাকলে কৃতার্থচিত্তে ওকে আলিঙ্গন করে বসত সে! ইভদোকিম বললে

কী করে সাশাকে ওরা পেয়েছে, কীভাবে ইভদোকিয়া ওকে বোতলে করে দুধ খাইয়েছে, অসুখ থেকে সারিয়ে তুলেছে, চুল আঁচড়ে দিয়েছে, কী করে ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না। বললে সাশা ইভদোকিয়াকে মা বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পরিবার থেকে ছেলেকে টেনে নেওয়া উচিত নয় — সুখে আছে সে এ পরিবারে।

'আর আপনার কী বলবার আছে?' ইভদোকিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন বিচারক।

'ছেলে আমি চুরি করিনি,' বললে ইভদোকিয়া, 'দাওয়ার ওপর বরফের মধ্যে আমি ওকে পেয়েছি। আমার কাছে রসিদও আছে।'

লাল টেবিলের ওপর সে আন্নার লেখা চিটটা রাখলে। এইটের ওপর ভারি বিশ্বাস ছিল ইভদোকিয়ার, ভেবেছিল কাগজের ওই টুকরোটা দিয়েই সাশার ওপর ওর অধিকার প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু চিটটা পড়ে বিচারকের মুখ চোখ আরো কুঁচকে উঠল — যেন ভিনিগার খেয়েছে; 'এ কী ছাইভস্ম যত সব,' বলে তিনি আন্নাকে হুকুম করলেন ছেলেটা চের্নিশোভদের হাতে পড়ল কী করে তা বলতে। ইভদোকিয়ার দিকে বিজয়িনীর মতো তাকিয়ে সে তার বাখানি শুরু করল। দুটি করে শব্দের পর পরই সে বিচারককে সম্বোধন করলে: "প্রিয় কমরেড বিচারক"। দাবি করলে, প্রলেতারীয় আদালত যেন বাড়ি মালিক পরগাছাদের বিরুদ্ধে তাকে, মেহনতী এক নারীকে সমর্থন করে।

'আচ্ছা, আর দরকার নেই' বলে সহকারীদের জিজ্ঞেস করলেন বিচারক, 'আপনাদের প্রশ্ন আছে?'

চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল পুরুষটি আর পাকা চুল মেয়েটি সদয় দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করলে:

'আর ছেলেটি কোথায়?'

প্রশ্নটা সে জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিয়ার চোখে চোখে চেয়ে, সাশাকে কেন আনা হয়নি এমনি যেন একটা ভর্ৎসনা ছিল সে দৃষ্টিতে। ইভদোকিয়ার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। সানন্দে, সস্নেহে সে তাকাল বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে।

বললে, 'ওই যে ওখানে। আমি নিয়ে এসেছি। ওইখানে বারান্দায় খেলছে। ডেকে আনছি!'

দরজার দিকে ছুটে গেল ও, কিন্তু ওকে থামিয়ে আদালতের লোককে পাঠান হল। কাতিয়ার সঙ্গে সাশাকে নিয়ে এল সে।

সাশার গায়ে নাবিকের নতুন জামা, পেণ্টালুন, টুপিতে সোনালী অক্ষরে লেখা "অরোরা"। বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তার, মা-বাপের কাছে কেমন আছে সে? সাশা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তবু বললে, সে সাশা চের্নিশোভ, ভালোই আছে সে। বিচারক বললেন, ওর অন্য মা আছে। সাশা জবাব দিলে:

'ধেৎ, মিছে কথা।'

বিচারক বললেন, এই অন্য মায়ের কাছে গিয়ে ও থাকতে চায় কিনা। আন্নাকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। আন্না ফোঁপাতে

শুরু করলে, চোখ মুছতে লাগল আর সাশা গিয়ে ইভদোকিয়ার গা ঘেঁসে তার স্কার্ট আঁকড়ে ধরল। এতেই শুনানি শেষ হয়ে গেল। বিচারক আর সহকারীরা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। ফিরে এসে বিচারক উঠে দাঁড়িয়ে রায় পড়লেন: সাশা চের্নিশোভদের কাছেই থাকবে।

সাশার হাত ধরে ইভদোকিম ও ইভদোকিয়া ঘরে ফিরল। প্রত্যেকেরই মনে হল, জয়টা তার জন্যই। ইভদোকিম ভাবলে, তার যুক্তিতেই বিচারকের মন টলে। ইভদোকিয়া ভাবলে, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সে সাশাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

আর সাশা ভাবলে, জজটা মিছে কথা বলেছিল: লাল-নাক ঐ মুখ পোড়া মেয়েটা কিছুতেই ওর মা নয়। শুধু একটা জিনিস সে বুঝলে না: মিছে কথাটা বললে কেন? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা ছিল না: ভাবতে শুরু করলে, কী কথা বললে মা'র মনে হবে তাকে আর কাতিয়াকে আইসক্রিম কিনে দেওয়া উচিত।

২১

কয়েক বছর কাটল।

ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে উঠল, লেখাপড়া শিখল। স্কুল শেষ করে পাভেল চলে গেল লেনিনগ্রাদে, ভর্তি হল শিল্প আকাদমিতে।

আমুর নদীর পারে শহর গড়লে নাতালিয়া, ছুটিতে বাড়ি এসেছিল শুধু একবার। আরো একবার আসার কথা ছিল, কিন্তু তার বদলে হাজির হল ক্রিমিয়ায়, শরীর সারাবার জন্য স্যানাটোরিয়মে পাঠানো হয়েছিল তাকে। তারপর দীর্ঘদিন আর বাড়ি আসেনি। তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়রিং পাশ করে, বিয়ে করে, ছেলে হয়।

তারপর এই এল; বসলে এসে রান্নাঘরে, একটু মোটা হয়েছে নাতালিয়া, পুরুষালি ভাব এসেছে চেহারায়, কোলে হৃষ্টপুষ্ট একটি ছেলে, সাজপোষাক একেবারে বড়ো ঘরের মেয়ের মতো। ইঞ্জিনিয়র! বিশ্বাসই হতে চায় না যে এ সেই নাতাশা, মায়ের ব্লাউজ পরে যে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল এই রান্নাঘরে, শুকনো, বুনো, অনাথা...

ইভদোকিয়া জিজ্ঞেস করলে, 'তোদের চলবে কেমন করে? ও রইল কমসোমল্‌স্কে আর তুই এখানে?'

'তা বটে, আমি এখানে, আর ও আপাতত কমসোমল্‌স্কে। কিন্তু কী করা, এখন অনেকের হালই এই রকম। লোক যে দরকার।'

ইভদোকিম জিজ্ঞেস করলে।

'কাজ করবি কোথায়?'

'তোমাদের কারখানায় বাবা, প্রধান কনস্ট্রাকটরের দপ্তরে।'

'আর পাভেল তো আমাদের শিল্পী হয়ে উঠছে।'

'সত্যি, বাহাদুর ছেলে। গুণ আছে।'

নাতালিয়া কেমন একটু কাটখোট্টা ভাব করে রইল — বোঝা যায় তার স্বাবলম্বী জীবনের ছাপ এটা। কোমলতায় চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম হলেই সে যেন তা চাপা দিত চোখের পাতা নামিয়ে। ইভদোকিম সাবধানে জিজ্ঞেস করলে:

'কোথায় থাকবি ভাবছিস?' কে জানে, হয়ত বা এ জায়গাটা ওর কাছে ভারি মামুলি লাগছে, ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়নদের কোয়ার্টারে থাকতে চাইবে হয়ত।

রান্নাঘরে চোখ বুলিয়ে নিল নাতালিয়া:

'কেন, তোমাদের এখানে খুব ঠাসাঠাসি বুঝি? কোনো সঙ্কোচ না করে সোজাসুজি বলো।'

'আমরা তোকে কোণের ঘরটা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে পারি,' কথার মাঝখানে সোৎসাহে বলে উঠল ইভদোকিয়া, 'শুধু কাতিয়াকে সঙ্গে নিবি। আর সাশা থাকবে ঐ চুল্লির ওপরে।'

নাতালিয়া রান্নাঘরে পায়চারি করতে করতে তাকালে ঘরগুলোর দিকে:

'আপাতত তাই চলুক। কিন্তু ওভাবে বেশি দিন থাকা মুশকিল। আমরা লোক অনেক, সকলেরই খানিকটা আড়াল দরকার, বিশ্রাম করা আছে, ভাবনা-চিন্তা করা আছে। কী বলো বাবা, দোতলা তোলা যাক একটা।'

'মালপত্র পাওয়া এখন মুশকিল।'

'তা জোগাড় করা যাবে। ভেঙা ফেলা হয়েছে এমন কোনো একটা কেঠো বাড়ি কিনে নেব।'

'আর টাকা?'

'আমি রোজগার করব। নিকলাই-ও পাঠাবে।'

'বেশ, লাগাও' বললে ইভদোকিম। নাতালিয়া বাপের বাড়িতেই থাকতে চাইছে, বাড়িটা বড়ো করে দোতলা তুলে সুপরিসর করে তুলতে চাইছে — এটা ওর কাছে ভারি ভালো লাগল। বড়ো হয়ে উঠেছে মেয়ে, ওর সঙ্গে সে এখন সমান সমান, কমরেড, সাংসারিক ব্যাপারে তার একটা ডান হাতের মতো। নতুন একটা অনুভূতি জাগল ওর, একটা সগর্ব প্রশান্তির অনুভূতি।

দোতলা তুললে ওরা। কিন্তু সেখানে বাস করা নাতালিয়ার প্রায় হল না। ওর স্বামী ইঞ্জিনিয়র নিকলাই লুকিয়ানভ এল; বললে, কাঠের ঘরে আর চালায় বাস করে করে ওর অরুচি ধরে গেছে; ওর ইচ্ছে স্নানের ঘর সমেত আধুনিক কোয়ার্টারে বাস করবে, ট্রেনে করে রোজ কারখানায় যাতায়াত করা ওর পোষাবে না, পায়ে হেঁটেই যেতে চায়। ইঞ্জিনিয়র টেকনিশিয়নদের কোয়ার্টার পেল ও, কারখানার কাছেই। সেখানেই উঠে গেল সে নাতালিয়াকে আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বাপের বাড়ির দোতলায় আস্তানা গাড়লে কাতিয়া তার গোলাপ আর জিরেনিয়ম নিয়ে।

২২

মিষ্টি খুব ভালোবাসত কাতিয়া, সাজতে গুজতে চাইত, নাচ পছন্দ করত খুব। বলত:

'জীবনে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি ট্যাঙ্গো, তারপর "সোনা মার্কা" চকোলেট, তারপর ভালো ভালো জুতো, তারপর বাদবাকি সব।'

সাতবছরী স্কুলের পর ও গেল টেলিফোনিস্টের কোর্সে। ওর ভারি ইচ্ছে হল নিজে রোজগার করে। ক্রুজিলিখায় টেলিফোন মেয়ের চাকরি পেল সে। সংসারের কাজ তার ভালো লাগত না, তবু ইভদোকিয়াকে সাহায্য করার জন্য সে সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজটাই বাছত: জল বইত, কাপড় কাচত, মেঝে ধুত, সবই করত ধুপধাপ করে, রাগে গরগরিয়ে ঝটকা মেরে। আর স্বেচ্ছায় যা কিছু করত, সেটা ফুলের পেছনে, অজস্র ফুল ফোটাত ও, আর সবই ঠিক ওরই মতো তাজা ফিটফাট।

রূপের খুব একটা বালাই ছিল না ওর — সরু সরু চোখ, নাক মুখ যেন কুড়ুলে কাটা, চওড়া কাঁধ, খাটো গড়ন। কিন্তু তবু তাতে ওকে এতটুকু খারাপ লাগত না, এতটুকু না! এমন জীবন্ত ছিল ও, এমন ফ্যাশন করে সাজ করত, চুল বাঁধত, আর নাচার সময় এমন লঘু নিপুণ পা ফেলত যে সবার কাছেই ভারি আকর্ষণীয় লাগত ওকে।

তরুণেরা ওকে নেমন্তন্ন করত থিয়েটারে, সঙ্গে করে এগিয়ে দিত, চাইত চুমু খেতে। এতে গর্ব হত কাতিয়ার। কিন্তু মনে মনে ও চাইত, কেউ ওকে সত্যিকারের মতো ভালোবাসুক, গভীর আবেগ ভরে ভালোবাসুক, উপন্যাসে যেমন লেখে তেমনি করে কারো মন পুড়ুক, নতজানু হয়ে দাঁড়াক, ঈর্ষায়

জ্বলুক, না ঘুমিয়ে রাত কাটাক, স্বপ্ন দেখুক ওকে নিয়ে।

ওর সঙ্গে ভাব হল কারখানার আপিস ঘরের টাইপিস্ট নাস্তিয়া নেফেদভার। নাস্তিয়ারও ছিল ঠিক তেমনি বারোমেসে ঢেউ খেলানো চুল, তেমনি যেন অবহেলায় কুঁদে তোলা মুখের গড়ন, আর ঠিক তেমনি ভালোবাসার জন্য আকুলতা। দুপুরের খাওয়ার ছুটির সময় হাতমুখ ধুয়ে, নাকে পাউডার ঘসে হাত ধরাধরি করে, ওরা খাবার ঘরের দিকে লম্বা বারান্দা দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটত, আর ছুটতে ছুটতে বলাবলি করত নিজেদের সব গোপন কথা।

ভারি ইচ্ছে হত কাতিয়ার কেউ ওকে ভালোবাসুক। ওর প্রেমের প্রতীক্ষা, প্রেমের জন্য ওর প্রস্তুতি যেন লেখা ছিল ওর মুখে। অবশেষে একটি লোকও পাওয়া গেল, যে তার এই প্রেমের আগুনে সাড়া দিলে।

কারখানায় মোল্ডার হয়ে ঢুকেছিল দ্মিত্রি কলেসভ্। বয়স অল্প হলেও লোকটা ছিল চমৎকার মিস্ত্রি, নিজের কাজে ওস্তাদ। কিন্তু তার খেয়ালী স্বভাবের জন্য কোথাও বেশি দিন টিকত না — ভাবতে লোকে ওর কদর বোঝে না। নানা শহরের অনেক কটা কারখানা বদল করলে, আর সব ছাড়লে ঝগড়াঝাঁটি করে।

কাতিয়ার সঙ্গে ওর আলাপ হয় ক্লাবে, ওর সঙ্গে নাচে, বাড়ি এগিয়ে দেয়। বিদায় নেবার সময় ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলে:

'আমার যে মন পুড়ছে তা কি চোখে পড়েনি আপনার? পড়েনি, না?'

গলার স্বর ওর গাঢ়, আবেগে কাঁপা; রসিকতা করলে না, আজেবাজে কম্প্লিমেণ্ট দিলে না; দেখেই বোঝা গেল লোকটা মার্জিত, জানে কী করে ভালোবাসতে হয়।

দোতালায় কাতিয়া উঠল যেন পাখায় ভর দিয়ে। মন পুড়ছে ওর! হয়ত বা রাতে ঘুম হয় না? ওর প্রশ্নের জবাবে কাতিয়া হেসেছে দেখে ও হয়ত বা এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে টলতে টলতে, মাতালের মতো?

আহ্, কী অপূর্ব হয় যদি এই কারণে টলতে টলতে যায় ও!

সে রাত কাতিয়া নিজেই ঘুমলে না। ভাবলে ওর কথা। মনে পড়তে লাগল তার চোখ, তার ঠোঁট, তার চুলের সিঁথি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করলে ও, দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে, আর উপন্যাসে যেমন লেখা থাকে তেমনি করে গরম কপালখানা চেপে ধরল ঠাণ্ডা শার্সির ওপর। উপন্যাসে অসাধারণ কিছু ঘটলে লোকে মাথা ঠেকায় শার্সিতে। আর অবশ্যই শার্সিটা থাকে ঠাণ্ডা, ললাট উত্তপ্ত।

প্রেম শুরুর অপরূপ রাত!

দ্মিত্রি কলেসভ... কী স্বগীয় নাম, খাঁটি সঙ্গীতের মতো; শুধু কান পেতে শোনো: দ্মিত্রি কলেসভ! দ্মিত্রি কলেসভ হয়ে উঠল কখনো রোমিও, কখনো ওথেলো, এবং কী নয়।

নতজানু হয়ে দাঁড়াল সে! ঈর্ষায় সে যন্ত্রণা দিতে লাগল কাতিয়াকে। ছুটির দিনে সে তাকে নিয়ে গেল শহরের বাইরে, কলরবের পৃথিবী ছাড়িয়ে।

সে যে কী সুখ! কোনো উপন্যাসেই তেমন কথা কখনো কিছু লেখেনি। সে সুখ যে সবার কাছ থেকে গোপন করা — তাই মনে হল কাতিয়ার। আর মিতিয়া যে খেয়ালিপনা করত, দাবি করত কাতিয়া যেন আর কারো সঙ্গে কথা না কয়, আর কারো দিকে চোখ তুলে না তাকায় — তাতে আরো বেশি সম্মোহিত, আকৃষ্ট হল কাতিয়া।

শুধু একবার, চুমুর মাদকতার মধ্যে সে মাথা ঠিক করে জিজ্ঞেস করেছিল, আর জিজ্ঞেস করেই লজ্জায় মরে গিয়েছিল, কারণ সে প্রশ্ন তার কাছে মনে হয়েছিল অসময়োচিত, স্থূল, অপার্থিব মোহটা ছিঁড়ে যায় তাতে। জিজ্ঞেস করেছিল:

‘মিতিয়া, বিয়ে হবে আমাদের?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ,’ উত্তর দিয়েছিল ও, ‘কিন্তু আরো কিছু দিন পর, কেমন? এই তো বরং ভালো, তাই না?’

‘এই ভালো,’ ফিসফিসিয়ে বলেছিল কাতিয়া।

২৩

সেটা ছিল সুবৎসর — সফলতার বছর একটা।

যে কলঘরে ইভদোকিম কাজ করত সেটা প্রথম স্থান

অধিকার করল কারখানায়। শ্রমিকেরা পেল মোটা বোনাস, ইভদোকিম পেলে নাম-লেখা সোনার ঘড়ি। উৎসব সন্ধ্যায় ইভদোকিয়া স্বামীর সঙ্গে গেল সংস্কৃতি-প্রাসাদে, নতুন পশমী গাউনের ওপর ব্রোচ লাগিয়ে সে বসলে সমারোহ করে, ভারিক্কি চালে; কাতিয়া তাকে নিজের সেণ্ট ঢেলে সুবাসিত করে দিয়েছিল। ইভদোকিম বসেছিল সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে, আর সবাই তাকে সম্মান করছে, প্রশংসা করছে, তার সেই প্রিয়তম স্বামীটির দিকে চেয়ে চেয়ে ইভদোকিয়ার আর আশ মিটল না।

হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে হল নাতালিয়ার, নাম দিলে এলেনা। অন্তঃসত্ত্বা বা প্রসবের জন্য নাতালিয়ার কাজ বাদ গেল না। কী একটা জরুরী প্রকল্প রচনার জন্য কমিশনে নেওয়া হয়েছিল ওকে, এমন কি রাতেও তার ডাক পড়ত টেলিফোনে।

ইভদোকিয়ার কাছে তার সবচেয়ে হৃদয়ের ধন ছিল সাশেংকা, বেশ ছেলেটি, একটু দুরন্ত ঠিক, কিন্তু মুখখারাপ করত না, গুণ্ডা .বদমাস নয়। ভলিবল খেলত আর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বই পড়ত কেবল।

মে মাসের শেষে এল পাভেল, শিল্পী পাভেল পেত্রভিচ চের্নিশোভ। সঙ্গে তার স্ত্রী — ক্লাভদিয়া, ভারি কাঁচা বয়স, ভারি ঠুনকো একটি জীব, সোনালি চুল, লাল নখ, আর অচেনা ফ্যাশনের গাউনে অদেখা নক্সা।

অত উঁচু হিলের জুতো পরা সম্ভব নাকি! তাও নাকি ও

হল ওর ছোট, সারাক্ষণ ও উঁচু করে তুলছে নিজেকে, টানটান হয়ে ও যেন সর্বশক্তি দিয়ে মেঝে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়বে। একসঙ্গে দু মিনিট ও একভাবে থাকে না, কেবলি ঢঙ বদলাচ্ছে ওর।

টেবিলে পাতা হল জমকালো টেবিলক্লথ। পান করা হল তরুণদের নামে। পাভেল লাল হয়ে উঠল, চোখ ওর আর বৌয়ের ওপর থেকে ফেরে না; পরিষ্কার বোঝা গেল ক্লাভদিয়া যেখানে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে সেখানেই ছুটবে ও।

'তোমাদের সবাইকে ওর ভারি ভালো লেগেছে,' ও বললে পরে, 'আর কাতিয়া তোকেও বেশ লেগেছে ওর।'

কাতিয়া বললে, 'ওকেও আমার বেশ লাগল — অসম্ভব ইনটারেস্টিং।'

'আর মা, তোমার?' জিগ্যেস করলে পাভেল।

'সুন্দরী, বলবার কিছু নেই।' ইভদোকিয়া বললে, 'তবে সবার সামনে ও লিপস্টিক বার করে ঠোঁট রাঙাল, এইটে শুধু আমার তেমন ভালো ঠেকল না।'

'কী যে বল তুমি! কত মেয়েই তো ঠোঁট রাঙায়।'

'তাই বলে অমন সবার সামনে নয়। আর সিগারেট খাওয়ারই বা কী দরকার? স্বাস্থ্য খারাপ হয়, চোখেও ভালো দেখায় না।'

'চমৎকার করে সিগারেট খায় কিন্তু,' কাতিয়া যোগ দিলে, 'বিভোর ভাব করে।'

'সিগারেট খাওয়া অবস্থায় ওর একটা পোর্ট্রেট এ'কেছি আমি,' পাভেল বললে, 'মুখটা দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ...'

'ওর মধ্যে চমৎকারের কী আছে? অল্পবয়সী মেয়ে কিন্তু ধোঁয়া ছাড়ে ইঞ্জিনের মতো।'

পাভেল হেসে চুমু খেলে ইভদোকিয়ার চুলে।

'সবই চমৎকার, অপূর্ব, মা।'

পাভেল এসেছিল অনেকদিনের জন্য — মিউজিয়মের জন্য ছবি আঁকবে তার বরাত নিয়ে। ওপর তলার বড়ো ঘরে ঠাঁই নিল পাভেল আর ক্লাভ্‌দিয়া, কাতিয়া উঠে গেল ছোট ঘরটায়। সাত সকালে উঠে পাভেল চলে যেত কামা নদীর তীরে, ইজেল পেতে ছবি আঁকত সেখানে। বাতাসে চুল উড়ে কাজের ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য একটা নীল বেরে টুপি মাথায় দিত সে। ইভদোকিয়া প্রাতরাশ নিয়ে যেত ওর জন্য। কেন জানি খেদ হত ইভদোকিয়ার, ও যেন কেমন ধারা, সবার মতো নয়, মাথায় একটা মেয়েলি টুপি পরে ঘুরছে, লোকে কাজ করে কলে কারখানায়, আপিস কাছারিতে, আর ও দেখো একা একা নদীর পাড়ে বসে কী যে আঁকছে...

আঁকার পর ও যেত ক্লাভ্‌দিয়ার ছুটির পর তাকে সঙ্গে করে আনতে। ক্লাভদিয়া কাজ নিয়েছিল শহরের দোকানদারি ব্যবস্থাপনার বিভাগে। সন্ধ্যায় ওরা হয় কোথাও বেড়াতে যেত নয়ত নেমন্তন্ন করত বন্ধুবান্ধবদের। অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা ক্লাভদিয়া করত ওপর তলায়, নিচে নামত না। ইভদোকিয়ার

এটা মনে লাগত। ওর মনে হত, মেয়েটা নিজের কাজটা কেমন চালায় কে জানে, কিন্তু পাভেলকে চালায় তো বেশ নাকে দড়ি দিয়ে, হাঁচি কাসি পেলেও আগে বৌয়ের দিকে চায় ছেলেটা।

২৪

সন্ধ্যার শিফটে কাজ পড়েছিল কাতিয়ার।

কী একটা পার্টি দিবস, কমিউনিস্টরা সবাই গেছে মিটিঙে, টেলিফোন কল কম। কাতিয়া বসে বসে ভাবছিল, গত বারের দেখা হওয়ার সময় কী ওকে বলেছিল মিতিয়া, মুখখানা ওর কেমন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ বারান্দা থেকে জানলা দিয়ে মাথা বাড়ালে নাস্তিয়া।

ও বললে, 'কাতিয়া, উহ্ কাতেচকা।'

সঙ্গে সঙ্গেই কাতিয়া টের পেল ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে।

ফ্যাকাশে হয়ে তাড়াতাড়ি করে ও জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার?' নাস্তিয়া চেয়ে দেখলে, কে যেন আসছে বারান্দা দিয়ে। তারপর হড়বড় করে বলে গেল:

'মিতিয়া কলেসভের বৌ এসেছে।'

কণ্ট্রোল বোর্ড থেকে ঘণ্টি বাজল। মরার মতো গলায় কাতিয়া বললে, 'কাকে চাই?'

চিফ ইঞ্জিনিয়রকে চাইল ফোনে। কাতিয়ার কানে গেল না, কানেকশনও দিলে না, নিথর হয়ে বসে রইল সারি সারি উজ্জ্বল ছিদ্র ভরা বোর্ডটার দিকে চেয়ে।

'লোকের কাছ থেকে সব শুনেছে,' কাতিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে ফিসফিস করলে নাস্তিয়া, 'ও আসছে তোর কাছে।'

বটে! কাতিয়া কাঁধ সোজা করে শক্ত হাতে লাইব্রেরি ঘরের সঙ্গে কানেকশন দিলে। লড়াইটা লড়াই। নিজের প্রেমের জন্য ওর যা কিছু হাতিয়ার আছে সব দিয়ে সে লড়বে। মিতিয়া ওকে প্রতারণা করেছে? তাই বলবে? প্রতারণা করেছে কারণ ভালোবাসে! তাতে কার কী? ভালো হোক খারাপ হোক ওকে সে কারো হাতে তুলে দেবে না। কারো পরোয়া করে না সে!

বারান্দায় পদধ্বনি কাছিয়ে আসছিল। কে যেন এল ভারি ভারি পা ফেলে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে। দরজায় নোটিস পড়ছে, খুঁজছে... কাতিয়া উঠে দাঁড়াল, লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে এল বারান্দায়।

করিডরের ফাঁকা টানেলটা বড় বড় ন্যাড়া বাতিতে আলোকিত। টানেলের ভেতর থেকে দেখা দিল একটা নারী মূর্তি। মেয়েটি লম্বা, মামুলী ছোটোখাটো ভ্রূহীন মুখ... এই মিতিয়ার বৌ? হালকা বাদামী চুলের খোঁপা এলানো; পুরনো হলদে একটা শালে কাঁধ ঢাকা। এতটুকু ছিরিছাঁদ নেই... মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, অসুখী! শাদা বাদামী ঝকঝকে দেয়ালটা দুলতে লাগল কাতিয়ার চোখের সামনে।

মেয়েটি এগিয়ে এল, দরজার বোর্ডে চোখ বুলিয়ে নিল,

দাঁড়াল। বাঁ হাতে এক মুঠো সূর্যমুখী ফুলের বিচি, বুকের কাছে ধরা, ডান হাতে খাচ্ছে, থুতনিতে লেগে আছে ছাই রঙের একটা খোসা। কাতিয়ার দিকে সে চাইলে — সে দৃষ্টিতে ঘৃণা নেই, আছে শুধু একটা শান্ত হতাশা: চিনতে পারলে। চিনতে পারলে এমন কিছু একটা দেখে যা ওর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়।

"পোয়াতী, একেবারে জলজ্যান্ত পোয়াতী" বিরস মনে ভাবলে কাতিয়া। কী বলবে তা সে জানত না, শুধু জানত যে মিছে কথা বলবে, কারণ মিছে কথা বলাই উচিত। "প্রসবের আর বেশি দেরি নেই। বাচ্চা হবে। বাচ্চার বাবা থাকবে না। আর মেয়েটা — একেবারে শাদামাটা মেয়ে। কার সঙ্গে সে লড়বে, লড়বে কী করে?.."

জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই আপনার?'

মৃদু গলায় মেয়েটি বললে:

'দেখছি।'

'কাজ আছে কোনো?'

'দেখছি...' উত্তেজনায় হাঁপালে মিতিয়ার বৌ, 'দেখছি, ঘর ভাঙিয়েরা দেখতে কেমন।'

কাতিয়া হাসল:

'ঘর ভাঙিয়ে? আমি কি ঘর ভাঙিয়ে নাকি? কাকে নিয়ে ঘর ভাঙলাম তোমার?'

'ভেঙেছ আমার স্বামী দ্‌মিত্রি ইভানিচ কলেসভকে নিয়ে। তুমি কোথাকার কে? কী তোমার উপাধি? আমার উপাধি কলেসভা, পাঁচ বছর ওর ঘর করছি, ন্যায্য রেজিস্ট্রি করা বিয়ে, আর তুমি কোথাকার কে?'

'পাঁচ বছর ঘর করেছ, ছয় বছরও করো, আমার তাতে কী? তোমার দমিত্রি ইভানিচকে আমার তো ভারি দরকার! কখনো দরকার পড়েনি, ভবিষ্যতেও দরকার হবে না। কোত্থেকে এমন ছুটে এলে?' অনুপ্রেরিতের মতো বলে চলল কাতিয়া, 'একেবারে ধেয়ে এলে কোথাকার কী গুজব শুনে!'

কলেসভা চটে উঠল:

'গুজব? আরে মেয়ে, লোকের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না! লোকে সব আমায় বলেছে! হাত ধরাধরি করে তোমরা ঘুরেছ...'

'আমার হাত ধরে কে না ঘুরেছে! আমার পাণিপ্রার্থী অনেক,' মিথ্যেয় গলা আটকে আসছিল কাতিয়ার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে ওকে, 'ভালো নয় গো, ভালো নয়; কোথাকার কী গুজব শুনে ছুটে এসেছ আমায় ঢিঢি দিতে। আমি বলে বিয়ের উদ্যোগ করছি, আর তুমি আমার নিন্দে রটাতে চাও কে জানে কেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, এই বলছি, আজ থেকে তোমার দ্‌মিত্রি ইভানিচ আর আমার কাছ ঘেঁষবে না। শতহস্ত দূরে থাকবে সে। তোমার সব লোকেদের কাছ থেকে যাচাই করে দেখতে পারো! ওর দিকে চাইব না,

"নমস্কার"ও জানাব না! ও তোমারই রইল, নাও গো!' বলে কাতিয়া চলে গেল টেলিফোনের ঘরে।

'মিছে কথা!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হতভম্বের মতো বললে কলেসভা।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে কাতিয়া।

'এখনো দাঁড়িয়ে আছ? ফিরে যাও, যা বলবার বলেছি, আর কিছু বলবার নেই।'

'ছলনা করছ তুমি,' দ্বিধাভরে বললে কলেসভা।

'কাজে বাধা দিয়ো না তো!' বলে উঠল কাতিয়া, 'কাজ ফেলে তোমার কাছে গিয়ে শপথ করার সময় নেই! যাও তো, যাও, রেজিস্ট্রি করা বৌ, স্বামীর ঘর করো গে, নির্ভয়ে ছেলে বিয়োও!'

'রাগ কোরো না আমার ওপর,' মিনতি করলে কলেসভা, কেঁদে ফেললে।

কাতিয়া বললে, 'রাগ করছি না, কেঁদো না বাপু। তুমি বড়ো ঠাণ্ডা... পরের বার, বুঝেছ, নিজের সুখের জন্য অমন ধারা লড়াইয়ে চলবে না।'

'তবে কেমন ধারা?' সরল মনে জিজ্ঞেস করলে কলেসভা, কাতিয়ার দিকে এবার চাইলে বিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে।

কাতিয়া বললে, 'কেমন ধারা জানি না, আমায় কখনো লড়তে হয়নি, তবে — অমন করে নয়।'

কাতিয়ার নজরে পড়ল কন্ট্রোল রুম সেই থেকে পাঠাগারের

সঙ্গে কানেক্‌ট করা আছে। কানেকশন কেটে দিলে সে। কাল তার কপালে বকুনি আছে। হয়ত বা তার চাকরিই যাবে। ওর কাছে সবই সমান।

কলেসভা চলে গেল। ফুটো ভরা বোর্ডটায় মাথা দিয়ে বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়ল কাতিয়া।

'কাতেচকা!' নাস্তিয়া বললে, 'তুই এ কী করলি, শতহস্ত দূরে...'

'ওর ছেলে হবে,' কাতিয়া বললে, 'তুই তো দেখেছিস।'

'তবু তুই এ করলি কী বলে!' নাস্তিয়া বললে।

'পালা তো এখান থেকে,' নাস্তিয়ার দিকে শুকনো ধূসর মুখ তুলে ফিসফিসিয়ে বললে কাতিয়া — সে মুখ যেন কাতিয়ার নয়, অন্য কারো, 'আমায় জ্বালাস নে। ওহ্‌, আহাম্মুক কী আহাম্মুক আমরা...'

কলেসভাকে যে কথা দিয়েছিল তা সে পুরো রাখেনি। সপ্তাহ না যেতেই মিতিয়া তার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মিতিয়াকে সে তাড়িয়ে দেয়নি বরং কথা বলেছে তার সঙ্গে। তবে "নমস্কার" বিনিময় করেনি ওরা, বলেছে "বিদায়"।

কলেসভার সঙ্গে এই সাক্ষাৎটা হয় উনিশ শো একচল্লিশ সালের জুন মাসে, বাইশে জুন যুদ্ধ শুরু হয়, তার কয়েকদিন আগে। মিতিয়াকে সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদলে যেতে হয়। সমর কমিশারিয়েতে যাবার পথে সে এসে দাঁড়ায় কাতিয়ার জানলার কাছে, পরনে তার বাজে একটা পোষাক — ভালো স্যুট বাড়িতে

রেখে দিয়ে পুরনো যা ছিল তাই একটা পরেই লোকে তখন যায় — কাঁধে ঝোলানো অ্যাণ্টি-গ্যাস ব্যাগ। হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেছে ওর, আগে যা কখনো ওর মাথায় ঢোকেনি, তা যেন এই প্রথম ভাবতে শুরু করেছে সে...

২৫

ডাক এল পাভেলের নামেও। খুশির ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে সে বললে ইভদোকিয়াকে, 'চললাম মা লড়তে।'

কাজ থেকে ঘরে ফিরে ক্লাভদিয়া দেখল ঘরজোড়া আয়োজন: পাভেল তার ছবিগুলো বেছে রাখছে, ময়দা মাখতে লেগেছে ইভদোকিয়া, কাতিয়া কেচে দিচ্ছিল পাভেলের জামাকাপড়। ক্লাভদিয়া আহ উহ করলে, ফ্যাকাশে হয়ে গেল, চটে উঠল:

'তুমি তো শিল্পী... আমি বুঝি না... তোমার হৈচৈ করা উচিত... এ একেবারে অসম্ভব, প্রতিভাবান শিল্পী চলল গুলি খেতে।'

অত্যন্ত মৃদু গলায় পাভেল বললে:

'কী বলছ ক্লাশা, ভেবে দেখ একটু।'

ক্লাভদিয়া কেঁদে ফেলে গলা জড়িয়ে ধরলে ওর:

'রাগ করো না! আমি যে তোমায় ভালোবাসি! এই কি আমাদের সুখের শেষ?..'

'জানি না,' পাভেল বললে, 'কিন্তু বেঁচে আমি যতক্ষণ থাকব, তোমায় ভালোবেসে যাব। মনে রেখো।'

'কিছুই শেষ হচ্ছে না,' কাপড় কাচার টবের ওখান থেকে বলে উঠল কাতিয়া। "বারোমেসে" ঢেউ তোলা রোমাশকা ফুল দিয়ে মাথা-ঘসা চুলের গুচ্ছটা কপাল থেকে ভেজা হাতে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। 'কিছুই শেষ হচ্ছে না। আচ্ছা নাকি কান্না শুরু হয়ে গেল।' কাপড় কাচার টবটা ধরে ঝাঁঝের সঙ্গে সে বললে, 'সরে যাও, নয়ত পায়ে ঢেলে দেব। সব এসে জুটেছে এখানে...' বলে ময়লা জলটা হড়াৎ করে বালতিতে ঢেলে দিল, মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল খানিকটা।

'কী হয়েছে তোর? বলি হল কী?' পাভেল আর ক্লাভদিয়া ওপরে চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিয়া, 'ভাই ফ্রন্টে যাচ্ছে আর তুই ঝাঁঝ দেখাচ্ছিস।'

'তবে কি দরদ দেখাবে!' বললে কাতিয়া, 'নিজেই আমি যাচ্ছি ফ্রন্টে। কিচ্ছু বলতে এস না আমায়!' চেঁচালে কাতিয়া। 'ফ্রন্টে যাচ্ছি, আবার ফিরেও আসব — দেখে নিয়ো ফিরি কিনা!'

'ফুঃ কীবা আমার ফুটানি,' চটে উঠে বললে ইভদোকিয়া, 'তলোয়ার ধরতে হয় কী করে তাই জানিস না।'

'এক নম্বর, জানি মা জানি। শুধু ওটাকে তলোয়ার বলে না, বলে রাইফেল।'

'তাছাড়া,' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদগ্র হয়ে শুনছিল চোদ্দ

বছরের সাশা, বললে, 'তাছাড়া কাতিয়া তো ন্যায্যতই তার নিজের কাজে যেতে পাবে: সিগন্যালারের কাজ!'

'ভারি তুই জানিস কী ন্যায্য,' ইভদোকিয়া বললে, 'ভগবান জানেন এ যে কী — কুমারী মেয়ে চলল যুদ্ধে।'

কাতিয়া চুপ করে রইল, শুধু ছপাৎ ছপাৎ করে চলল তার কাপড় কাচা।

'বাবা জানে?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিয়া।

বাপ জানত। কারখানাতেই সে শুনেছিল, কাতিয়া দরখাস্ত দিয়েছে অ্যাকটিভ আর্মিতে যাবে। ইভদোকিম শুধু মাথা নেড়েছিল — বলার কিছু ছিল না। বলাবলি করছিল অন্যরা, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল:

'তাহলে ট্যাঙ্গো আর জুতো, তার কী হবে?'

'ও সে সব শান্তির সময়ে,' জবাব দিয়েছিল কাতিয়া। 'লড়ব, তারপর ফের আমার সখের জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে নাচতে যাব।'

পাভেলের বিদায়টা ভারি বিষণ্ন হয়ে দাঁড়াল যদিও সবাই সংযতই ছিল। পরনে পুরনো স্যুট, কাঁধে থলি — শিল্পী বলে বিশেষ একটা প্রতিভা, বিশেষ একটা ভাগ্য দিয়ে আলাদা করা একজন মানুষ বলে আর পাভেলকে চেনা যাচ্ছিল না — একেবারে মামুলী একজন রিক্রুট সে, হুবহু অন্য সমস্ত তরুণদের মতোই। স্বচ্ছ ফ্যাশন দুরস্ত স্ট্র টুপি পরা ক্লাভদিয়া ছিল ওর পাশে দাঁড়িয়ে। পাভেলের ইচ্ছানুসারে ও একা ওকে

বিদায় দিতে যাবে রিক্রুটিং সেণ্টার পর্যন্ত। বাকি সবাই বিদায় জানালে বাড়ি থেকেই। স্বামীর সঙ্গে নাতালিয়াও এসেছিল। শুভ যাত্রা কামনা করে প্রথামত কিছুক্ষণ বসল সবাই। সবাইকে চুমু খেল পাভেল, বললে:

'মা, মা আমার, কখনো আমি...'

কথা ও শেষ করলে না। ইভদোকিয়ার দুই হাত জড়ো করে মাথা নুইয়ে চুমু দিলে তার শক্ত স্নেহভরা করপুটে। তারপর বেরিয়ে গেল, যাবার সময় আনাড়ীর মতো কাঁধটা ঘসে গেল দরজার কাঠে। ফুঁপিয়ে উঠে ওর দিকে ঝাঁপিয়ে গেল কাতিয়া। গোটা পরিবার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে পাভেল, বাড়ি থেকে দূরে আরো দূরে। ক্লাভদিয়া ওর সঙ্গে, হাত ধরে ছিল ওর। কিন্তু কেমন যেন ও আলাদা হয়ে গেছে ওর কাছ থেকে, যেমন আলাদা হয়ে গেছে সবার কাছ থেকেই।

পরে গেল নাতালিয়ার স্বামী। তারপর কাতিয়া। ফাঁকা হয়ে গেল চেনিশোভদের বাড়ি।

২৬

ভূগোল পড়েনি ইভদোকিয়া কখনো ভাবেনি সোভিয়েত ইউনিয়নে এত অসংখ্য শহর থাকতে পারে। উরাল সে জানত, সেখানে তাদের শহরটা, তাছাড়া চেলিয়াবিন্‌স্ক, পের্‌ম্‌,

স্ভের্দলভ্স্ক, নানা গঞ্জ যেমন কুরিয়া, আগের দিনে ইভদোকিয়া যেখান থেকে বিচালি কিনত গরুর জন্য। আরো আছে নভসিবির্স্ক, কিয়েভ — আগে তার নাম ছিল ভিয়াৎকা, আছে গোর্কি আর অনেক দূরে মস্কো আর লেনিনগ্রাদ। আর হঠাৎ কিনা দেখা গেল শহর আমাদের প্রচুর, জার্মানরা তা নাকি কেবলি দখল করছে। সে আবার কী? কোথায় গিয়ে থামবে ওরা, বদমায়েসরা?

প্যান প্যান করা স্বভাব ছিল না ইভদোকিয়ার, আগের মতোই শান্ত হয়ে সে ছিল, কিন্তু বুকের ব্যথা তার থামেনি। ছেলেমেয়েগুলো! ছেলেমেয়ে! পাশা! কাতিয়া! জোয়ান বয়স, আদরের ধন সব! সাশেংকাও বেড়ে উঠছে, সেও যাবে লড়তে, নিজের পালার জন্য সে অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে উঠেছে। সাশেংকা — তার যন্ত্রণার ধন, তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দ!.. চুল্লির ওপর কড়াই নাড়তে নাড়তে সে বিড়বিড় করে রাজা ডেভিডের স্তোত্র আওড়ায়, "নিশীথের ত্রাস হইতে, দিবালোকে নিক্ষিপ্ত বাণ হইতে, অন্ধকারে আবির্ভূত প্রেত হইতে, অপরাহ্নের দৈত্য দানব হইতে নির্ভয়... গৃধিনী সরীসৃপকে পদদলিত করো, দমন করো সিংহ সর্প ..." কিন্তু গৃধিনীরা তবু কেবল সামনেই এগিয়ে যায়। উক্রেন দখল করলে ওরা, অবরোধ করলে লেনিনগ্রাদ, গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মস্কোর দরজায়।

লেনিনগ্রাদ, মস্কো, কিয়েভ থেকে এসে পৌঁছতে লাগল

ইভাক্যুইরা। প্রতি বাড়িতেই তাদের বাসের ব্যবস্থা হল। ইভদোকিয়ার বাড়িতে ওপরের ঘরখানা নিল লেনিনগ্রাদ থেকে আগত এক প্রফেসার, তার বৌ আর দুটি শালী। শ্বেতকেশ কোমলপ্রাণ প্রফেসারকে দেখে মায়া হত ইভদোকিয়ার। সন্তর্পণে, চুপিচুপি আনাড়ীর মতো সে নেমে আসত ওপর থেকে, ফেল্টবুট পরতে জানত না সে, শব্দ না করে জল না ছিটিয়ে মুখ ধোবার চেষ্টা করত বারান্দার ঝোলানো জল পাত্রটা থেকে। আর মেয়েগুলোর সঙ্গে, প্রফেসারের বৌ আর শালীদের সঙ্গে ইভদোকিয়ার প্রথম দিনেই মৃদু কণ্ঠে হলেও তীব্র একটা লড়াই হয়ে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে। লেনিনগ্রাদে কেমন এদের ফ্ল্যাট, কেমন আসবাবপত্র, কতো মিউজিয়ম, থিয়েটরে যেত ওরা এই নিয়ে প্রশংসার আর অন্ত ছিল না ওদের, আর এখন ভারি খেদ যে অসহনীয় একটা অবস্থায় বাস করতে হচ্ছে। সাধারণ রীতিনীতি, ঘর সংসারের কাজ এদের একজনও শেখেনি। দেশী রুশী চুল্লিতে রান্না করতে এদের একজনও পারত না। মনের ভাব চেপে রেখে ওদের সাহায্য করত ইভদোকিয়া, ওদের জন্য ঘরদোর পরিষ্কার করে দিত, নোংরা বিশৃঙখলা সে সইতে পারত না। ও করত ঘরদোর পরিষ্কার আর ওনারা আহত ভাব করতেন, দেখিয়ে দিতেন কেমন ও অমার্জিত, কী বাজে, সেকেলে ওদের বাড়িটা। ইভদোকিয়ার মনে হল ওদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটাই বৃথা। কাজ নেই

বাপু, অমন তিন বচনবাগীশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না ও। ওদের সে সইতে পারত না, কেবল প্রফেসারকে মান্যি করত, তার কাজ-কম্ম করে দেবার চেষ্টা করত।

আর কী আশ্চর্য, ভাড়াটেদের সঙ্গে শত্রুতা করে ইভদোকিয়ার ভার যেন একটু কমত, দুঃসময়ের দিনগুলো কাটাতে সাহায্য হত তার।

আর শেস্তেরকিন ফের মদ ধরলে। একবার মাতাল হয়েই এল, কাঁদল, হাঙ্গামা বাধাল, ইভদোকিয়াকে ভয় দেখাল যে শিগগিরই জার্মানরা তার বাড়িতেও বোমা ফেলতে শুরু করবে আর তার ফলে কী রকম সব ছারখার হয়ে যাবে দেখাতে গিয়ে দুটি ফুলের টব ছারখার করলে। ইভদোকিয়া ক্ষেপে উঠে ওকে বের করে দিলে। ও চেঁচালে:

'হাঁদা বোকা মাগী। ভেবেছিস আমি মাতাল! মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে বলে আমি নেশা করি! মান গেল এই জ্বালায়। বোকা কোথাকার!..'

সে বছর শীত এল আগে ভাগেই, আর প্রখর, ভয়ংকর সে শীত। দুরন্ত তুষার ঝঞ্ঝা বইত কালো কালো বনগুলোর ওপর, কঠোর শহরটার বুকে, ক্লুজিলিখার দিনরাতি ধূমায়িত চিমনিগুলোর মাথায়। মেঘের দিকে পাক দিয়ে উঠত তুষার ঝড় আর তুহিনে দুর্যোগে পাথর হয়ে উঠত প্রাণ। মাতাল শেস্তেরকিন চলে যেতেই ইভদোকিয়া বাক্সের ওপর বসে বসে দু হাত গুটিয়ে গোঙালে। সে কান্নায় অশ্রু ছিল না। সে মুহূর্তের দুঃখটা ওর

ছেলেমেয়েদের নিয়ে নয়, শেস্তেরাকিনের মতোই বিপুল কি একটা লাঞ্ছনা বোধ করছিল সে, যা নিজেও সে ভালো করে ধরতে পারছিল না।

'পোড়ারমুখোরা সব!' বিড়বিড় করছিল সে।

ইভদোকিম এসে ওকে ঐ অবস্থায় দেখলে। ওকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে:

'কী হল দুনিয়া? ছি, কাঁদে না। কাটিয়ে উঠব আমরা...'

স্মিদি শপে ও তখন ফোরম্যান, অঢেল কাজ, অনেক সময় সপ্তাহ ধরে বাড়ি ফেরাই সম্ভব হত না। প্রতিনিধি হিসাবে ওকে দেখতে হত ইভাক্যুইদের ব্যাপার, তাদের জন্য ঘর তোলা, তাদের অসুখবিসুখ, অভাব অভিযোগ। ক্লান্ত হত না সে, সত্যিসত্যিই ক্লান্তি বোধ করত না: ক্লান্তির সময় ছিল না। তবু মাঝে মাঝে ওর বিচক্ষণতা টুটে যেত, বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করত, চেঁচামেচি করত লোকজনের ওপর। নিজেকে তখন ও বোঝাত, "আস্তে! ধৈর্য ধরে! এতো সবে শুরু। ভবিষ্যতে অনেক আছে, মেজাজ হারিয়ো না!" তারপর ফের আবার বেসামাল হয়ে পড়ত। সবচেয়ে বেশি করে ওকে রাগিয়ে দিত ইভাক্যুইরা, কিছু না কিছু নালিশ ওদের লেগেই আছে, কিছু না কিছু দাবি আছেই। ও বকাবকি করত, গলা চড়াত, পরে লজ্জা হত: মনে পড়ে যেত, এরা নিজেদের ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এসেছে, অনেকে ফেলে রেখে এসেছে সংসার। এই যে লোকটার ওপর ও এখুনি চোটপাট করলে তার ছেলেমেয়ে মা বৌ রয়েছে এখান

থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, অবরুদ্ধ শহরে — হয়ত বা ক্ষিদেয়, ঠাণ্ডায় মারাই গেছে, হয়তবা বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছে আর ও লোকটা লেদমেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে খেটে যাচ্ছে... ঠাণ্ডা গলায় ইভদোকিম বলত:

'নে, রাগ করিস না। বেশ, ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা কইব, নতুন বাসার একটা চেষ্টা করা যাবে...'

নাতালিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত কারখানায়। দুটি কথা হত তাদের — নিকলাই কী লিখেছে, ছেলেমেয়েরা কেমন... একদিন চোখে পড়ল নাতালিয়া শুকিয়ে গেছে, রঙ হয়েছে হলদেটে। নজর করে দেখল, ওর রগে পাকা চুল... ইভদোকিম জিজ্ঞেস করলে:

'অমন হাল কেন তোর?'

নাতালিয়া ভুরু কোঁচকাল:

'যেমন সকলের তেমনি।'

'মরদ কী লেখে?'

'বিশেষ কিছু নেই। বেঁচে আছে।'

'ছেলেমেয়েদের তুই আমার ওখানে পাঠিয়ে দে। ওখানেই থাক।'

'বেশ বললে। আমি জন্ম দিলাম, আর মায়ের ঘাড়ে চাপাব?'

'তুই বেশি কথা বলিস না তো,' ততক্ষণে চলে যেতে যেতে চ্যাঁচাল ও, 'দিয়ে আসিস আমাদের ওখানে, এই বলে দিলাম তোকে!'

দিনরাত ধোঁয়া ছেড়ে চলল ফুলিজলিখার চিমনিগুলো।

তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম পানে চলতে থাকল ট্যাঙ্ক আর অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেন।

একদিন বাড়ি এসে ইভদোকিম বললে ইভদোকিয়াকে:

'জানিস, দুনিয়া, জার্মানদের ভাগিয়ে দিয়েছে মস্কো থেকে।'

২৭

দিন যায়। বছর যায়।

শত্রু মার খেয়েছে। শকুনের পালকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমে। খাস ফাসিস্ট জার্মানির সীমান্তেই কোথায় যেন এখন লড়ছে পাভেল আর ইয়েকাতেরিনা চেনির্শোভ। রোজ সন্ধ্যেয় বিজয়ের খবর ব্রডকাস্ট করে রেডিও; লোকের মুখে চোখে ফুর্তি, আনন্দ।

অপেক্ষা করে করে অবশেষে পালা এল সাশেংকার, নাম লেখালে স্বেচ্ছা সৈনিক হিসাবে। কিন্তু ফ্রণ্টে যাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারল না। জাহাজেও পেঁছিল না সে, ইভদোকিয়ার বুক ভয়ানক শান্ত করে সে আটকা পড়েছে স্থল বাহিনীর স্কুলে।

নাতালিয়াকে প্রধান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়রের সহকারীর পদ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়ে ভোলদিয়া আর লেনা অনেক আগেই উঠে গেছে কিরভ্ স্ট্রিটে, ইভদোকিয়ার কাছে। নিজে সে থাকে কারখানায়, রাত কাটায় ডিউটি ঘরে। কনস্ট্রাকশন

ঘরে ওর খাবার, জলখাবার যায়। কেমন যেন আরো বড়ো মানুষ হয়ে উঠেছে সে, ওর গলার স্বরে চালে চলনে কর্তৃত্বের ছাপ। স্বপ্ন সফল হচ্ছে ওর। ওর মনে হত, সারা জীবনটা ওর কারখানায়; ছেলেমেয়েদুটো যেন একটা ব্যাঘাত — বৃথাই জন্ম দিয়েছে ওদের... কিন্তু হঠাৎ ওদের হামজ্বর হল, আর দেখা গেল কাজে মন দেওয়া ওর পক্ষে কঠিন হচ্ছে, সন্ধ্যার জন্য হাপিত্যেশে চেয়ে থাকে সে, তখন ওদের কাছে যাবার ফুরসুৎ মেলে, নিজের হাতে ওষুধ খাওয়ানো যায় ওদের, থার্মোমিটার দেওয়া যায়, আদর করা যায়। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে সে নিজে উদাসীন, র‍্যাশন কার্ড নিয়ে আলাপে সে ঠোঁট বাঁকায়, কিন্তু নিজেই সে এখন আনন্দে আটখানা — কারখানার দোকানে জ্যাম — খাঁটি চিনির জ্যাম এসেছে। ভর্তি বয়াম নিয়ে সে আসে হাসিমুখে, ভাবে কী খুশিই না হবে ছেলেমেয়েরা, কী রকম হৈচৈ শুরু করবে লেনা আর ভোলদিয়া চ্যাঁচাবে, "দিদিমা, আমার চামচ কই দিদিমা?"

দিন যায়।

কাগজে পদকপ্রাপ্তদের তালিকায় নাম ছাপা হল পাভেল পেত্রভিচ চের্নিশোভের। ইভদোকিম আর ইভদোকিয়া অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখার জোগাড় করছে হঠাৎ পাভেলের চিঠি এল হাসপাতাল থেকে: বিশেষ কিছু গুরুতর নয়, আঘাতটা অল্প, কিছু রক্তস্রাব হয়, কিন্তু রক্ত দিয়েছে ওকে, ইতিমধ্যেই সেরে উঠছে। কথাটা সত্যি হলে তো ভালোই!.. ও অনুরোধ করেছে

ব্যস্ত না হতে, কেবল আরো ঘন ঘন যেন চিঠি লেখে। কেন জানি খুব কম চিঠি আসে ক্লাশার... ক্লাভদিয়া নিঃশব্দে চোখ ফেরালে আর আস্তে করে নিঃশ্বাস ফেললে ইভদোকিয়া। এই তো এর মধ্যেই দুবার এসেছিল কে একটা লোক, ফ্যাশন দুরস্ত ওভারকোট, কালো মোচ, দেখতে মন্দ নয়, ভদ্র, অমায়িক — বারান্দায় ইভদোকিয়াকে দেখে সরে দাঁড়ায়, টুপি তুলে নমস্কার করে... কিন্তু ইভদোকিয়া বাজি রেখে বলতে পারে, ভুরু ওর মেয়েদের মতো কামানো; ভগবান ওর মঙ্গল করুন, কিন্তু লোকটাকে ভালো লাগেনি ইভদোকিয়ার। ক্লাভদিয়াকে সে জিজ্ঞেস করলে:

'কাজে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, কাজ ছিল।' ছোট্ট এই একটু জবাব দিয়েছিল ক্লাভদিয়া, সারা দিন ওরা আর পরস্পর কথা কয়নি — রেগে ছিল দুজনে।

এর পর কামানো ভুরুওয়ালা কন্দর্পটি আর দেখা দেননি। কিন্তু সন্ধ্যায় ঘরে থাকা ক্লাভদিয়ার একেবারে বন্ধ হল।

তার চেয়েও বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ইভদোকিয়া নজর করেনি, কাতিয়ার ফারের জর্জেটটা পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছিল। কাতিয়া ভেবে রেখেছিল এ জর্জেটটা দিয়ে সে কলার ও টুপি বানাবে, কিন্তু পোকায় কেটে একেবারে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জায়গায় তিনটে টাক ফেলে দিয়েছে। ইভদোকিয়া

ভেবে কূল পেল না এ দুঃসংবাদ কাতিয়াকে সে লিখে জানাবে কী করে।

মস্কোবাসী, লেনিনগ্রাদবাসী, কিয়েভবাসীরা সবাই যে যার শহরে ফিরল। নিজের মুখরা কটিকে নিয়ে প্রফেসার চলে যান চুয়াল্লিশ সালের শরতে। চার জনেই ওরা ইভদোকিয়ার আতিথেয়তার জন্য অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানালে, সত্যি, বাজে কথা নয়, এই সব কুঁদুলে বুড়িরাও ওকে ধন্যবাদ জানালে চোখে জল নিয়ে, চুমু খেলে, বাড়ি ফিরছে বলে ভারি খুশি সবাই। ইভদোকিয়া ওদের যাত্রায় আয়োজন করে দিলে আর স্মৃতি হিসাবে প্রফেসারকে বুনে দিলে একজোড়া উলের মোজা।

২৮

থিয়েটার থেকে ফিরল ক্লাভদিয়া, চেয়ারের ওপর হাঁটু গেড়ে, টেবিলে গা এলিয়ে আলস্যভরে বললে:

'কাল তো আমি চললাম।'

'আপিস থেকে পাঠাচ্ছে বুঝি কোথাও?' জিজ্ঞেস করলে ইভদোকিম। ক্লাভদিয়া উঠে দাঁড়াল, একেবারে টানটান করে তুললে নিজেকে, এই বুঝি মাটি ছাড়িয়ে উড়তে থাকবে। সিগারেটের বাক্স থেকে সিগারেট বার করে পাকালে:

'না, একেবারেই চলে যাচ্ছি। আগুনটা দিন, ইভদোকিম নিকলাইচ।'

ওর সামনে লাইটারটা ধরে ইভদোকিম ফের জিজ্ঞেস করলে:

'একেবারেই মানে কী?'

তোয়ালে আর ডিশ হাতে ইভদোকিয়া নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল। যথাসাধ্য জোরে ধোঁয়া টেনে ক্লাভদিয়া বললে:

'একেবারেই... তাই দাঁড়াচ্ছে।'

বলে কেঁদে ফেলল:

'যেন আমারই দোষ। মনের ওপর কি হুকুম চলে নাকি? আমি সুখ চাই... একে কি জীবন বলে! যৌবন তো আর চিরকাল থাকে না...'

মৃদুস্বরে ইভদোকিম বললে:

'বেশ তো। নয় ধরেই নিচ্ছি, মন দিয়ে বসেছ। কিন্তু মনে রেখো যে পাশা এখনো হাসপাতালে।'

'আপনারাই তো কাল আমায় বোঝালেন বিপদের কিছু নেই। ফ্রণ্টের পেছনে লোকেদের যা অবস্থা তাদের অনেকের চেয়েই ও হাসপাতালে অনেক বেশি সুস্থ।'

'তবু অত সহজ নয় ব্যাপারটা — আজ একজনকে নিয়ে সুখ, কাল আর একজনকে নিয়ে। আর এই হঠাৎ করে — চললাম।'

'ও লোকটা দুঃখী,' ক্লাভদিয়া বললে, 'লাতভিয়ায় বাড়ি, ফাসিস্টরা ওর আত্মীয় স্বজনকে মেরে ফেলে।'

'চলে যাবার জন্য এত তাড়া কেন?' ইভদোকিম বোঝালে, 'কয়েকমাস সবুর কর না কেন; পাভেল আসুক, আর তো দেরি নেই। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নাও। পাশাকে হয়ত তোমার বেশি ভালো লাগবে।'

কেঁদে ফেলে হো হো করে হেসে উঠল ক্লাভদিয়া, একেবারে হঠাৎ করে।

'কী অদ্ভুত লোক আপনি, ইভদোকিম নিকলায়িচ। এতে আলোচনার কী আছে? পুরনো ভালোবাসাটা মরে গেছে। ও দেশে ফিরে যাচ্ছে, আমিও ওর সঙ্গে যাব...'

'কথা শোনো, ক্লাশা!'

তাতে ক্লাভদিয়া তীক্ষ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল:

'শেষ কথা আমি ওর বৌ!'

ইভদোকিম উঠে চলে গেল শোবার ঘরে।

ইভদোকিয়া বললে:

'আর ভুরু কামায় কেন ও? দুঃখী লোক তো ভুরুটা কামায় কেন?'

'আপনি চুপ করুন তো!' আরো তীক্ষ্ন গলায় চ্যাঁচাল, 'কী বোঝেন আপনি?'

বলে ছুটে গেল ওপরে, সিঁড়ির ওপর হিলের খটখট শব্দ তুলে। ইভদোকিয়া কী ভাবল, এ্যাপ্রন ছেড়ে রেখে হাত ধুল, তারপর ওভারকোট পরতে শুরু করল। এই সময় ইভদোকিম ঢুকল ঘরে:

'কোথায় চললি তুই, দুনিয়া?'

'নাতালিয়ার কাছে, কারখানায়।'

'কেন?'

'দেখি ও যদি ওকে বোঝাতে পারে।'

'ঘরে বসে থাক,' ইভদোকিম বললে, 'এসব ব্যাপারে নাতালিয়া ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে না।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে:

'নিজের কানেই তো শুনলি, ও ওর বৌ। ওই লোকটার...'

ইভদোকিয়া নিঃশ্বাস ফেলে ওভারকোট খুলতে লাগল।

নীরবে একঘণ্টা কাটল। ইভদোকিয়া বললে:

'আমি ওকে ডেকে আনি।'

'কেন?'

'রাতের খাবার ও কিছু খায়নি।'

'ডেকে আন,' বিষণ্ণ গলায় সায় দিলে ইভদোকিম।

ইভদোকিয়া ওপরে উঠে গিয়ে দরজা খুললে। ক্লাভদিয়া পোষাক আষাক পরেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ইভদোকিয়া বললে:

'ক্লাশা, খেতে এস।'

ক্লাভদিয়া বই রেখে কান্নায় ফুলে ওঠা চোখে তাকালে ওর দিকে। বললে:

'সত্যি বলছি, মা, এমনটা হল, ভয়ংকর বুক চেপে আছে। আহ্, বেচারা পাশা, বেচারা। কিন্তু আমার যে কিছুই করার

নেই।' ও বললে কেমন একটা সুখাবেশে, বই দিয়ে মুখ ঢেকে, 'আমি যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

২৯

লজেন্সের একটা পুরনো টিনের কৌটোয় জমিয়ে রাখা হয়েছে পাভেল, কাতিয়া আর সাশার চিঠি। এর প্রতিটি চিঠিই ইভদোকিম আর ইভদোকিয়ার মুখস্থ।

সাশার চিঠিটা এই:

"আদরের মা ও বাবা,

খুব একটা যাচ্ছেতাই মেজাজে তোমাদের চিঠি লিখছি, আর কী করে খুশি হওয়া যায়, কেননা সব কিছুই একটা সুতোর ওপর ঝুলছে এই বিদ্‌ঘুটে কারণে যে, জন্মাতে আমাদের বছর দুই কি এক দেরি হয়ে গেছে, অথচ ওদিকে যুদ্ধ শেষ হতে চলল, এবং আমাদের সামরিক বিদ্যালয়েই রেখে দেওয়া হচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে আমাদের নাকি ফ্রণ্টে পাঠাবে না, শেখাবে আর রসুই ঘরে খাওয়াবে, এমন কি খেল খতম হবার সময়ও আমাদের ডাক পড়বে তার কোনো আশা নেই — নৈরাশ্যবাদীর মতো এ কথাটা বলেছে আমাদের এক কমরেড; তার সঙ্গে আমরা দরখাস্ত পাঠিয়ে দাবি করেছি যেন আমাদের ফায়ারিং লাইনে পাঠানো হয় এবং তার কারণ জানিয়েছি এই যে আমরা পেছনে আটকা থাকব এই জন্য স্বেচ্ছা সৈনিক হয়ে আসিনি, তবে এ দরখাস্তে কোনোই ফল হয়নি, সুতরাং আমরা কমসোমল

কেন্দ্রীয় কমিটিতেও চিঠি লিখেছি এই আশায় যে, তারা আমাদের কথা বেশি বুঝবে, ফলাফল তোমাদের জানাব।

স্নেহের পুত্র

আলেক্সান্দর চেনির্শোভ।"

কাতিয়ার চিঠি:

"আদরের মা ও বাবা, তোমাদের চিঠিতে কী যে মন খারাপ হল বলবার নয়! কী যে দুঃখ হচ্ছে পাশার জন্য কী বলি!!! আর ক্লাভদিয়া — ও গেলেই বাঁচি! এতটুকুতেই প্রেম ওর ফুরিয়ে গেল! চুলোয় যাক গে ও!!! আমি পাশা হলে এতটুকু কাঁদতাম না! কিন্তু ও একেবারে ভয়ংকর কষ্ট পাবে, আমি জানি! ওকে ও ভয়ানক ভালোবাসে পাগলের মতো!!! বাবা ও মা! ও কেমন ভাবে নেয় তা তোমরা অবশ্য অবশ্য লিখবে! মামণি গো, নিনা কালিস্ত্রাতভনার কাছে আমার শাদা ড্রেসটা দিয়ো, যেটার পিঠ ছিঁড়ে গেছে! তা থেকে ও যেন একটা ব্লাউজ করে দেয় আমার জন্য! সুন্যটের জন্য বুঝেছ? খুব ফ্যাশন মাফিক!!! জানি না, লোকে এখন কী ফ্যাশনে সাজগোজ করে! ফ্যাসিস্টদের একেবারে গরুতাড়া করে খেদাচ্ছি। তোমরা তো কমিউনিকে থেকেই তা জানো! মামণি, নিনা কালিস্ত্রাতভনাকে বোলো, খুব যেন ঘাঁটাঘাঁটি না করে। তোমাদের সকলের জন্য শতশত চুমু — মা, বাবা, নাতাশা, ভোলদিয়া আর লেনচকার জন্য!!! চেনা

মেয়েদের সকলকে বোলো! যত পারো আরো ঘনঘন, আর সব খুঁটিয়ে লিখো!

চিঠির জন্য হাঁ করে আছি যেমন বসন্তের জন্য কোকিল!

তোমাদের কাতিয়া

পুঃ নিশ্চয় জানি, তোমরা ক্লাভদিয়াকে কিছুই বলনি! বলে লাভ নেই! মুখে আগুন ওর! আমি ওকে খুব একচোট শুনিয়ে দিতাম!"

পাভেলের চিঠি:

"প্রিয়জনেষু,

সহৃদয় পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন একেবারে সুস্থ, বাহিনীতে ফেরত যাচ্ছি। নতুন ঠিকানা দেব। বেশ ভালো বোধ করছি, আমার জন্য তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আবেগ-চুম্বন রইল।

পাভেল।"

ক্লাভদিয়া সম্পর্কে একটি কথাও নেই; যেন ক্লাভদিয়া বলে কেউ ছিল না...

৩০

শনিবারের সন্ধ্যায় কারখানা থেকে ফেরে নাতালিয়া।

ভুরু কুঁচকে ঠোঁট চেপে সে জল আনে বাঁকের ওপর, স্নানের ঘর গরম করে, ছেলেমেয়েদের স্নান করায়, সবই খুব চটপট,

নীরবে। পরে নিজে স্নান করে, তারপর সুন্দর ড্রেসিং গাউন পরে সতেজ আর লাল হয়ে বেরিয়ে আসে। ছেলেমেয়েদের চুমু খায়, বলে:

'শরীরের সব ক্লান্তি ধুয়ে ফেলা গেল।'

ছেলেমেয়েরা চুল্লির তাকের ওপরে বসে বসে পা দোলায়। নাতালিয়া ওদের শুইয়ে দিয়ে সরু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় দোতলায়, পাভেলের ঘরে। ক্লাভদিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে সেখানে কেউ থাকে না। দেয়ালে ছবিগুলো টাঙানো। একটা ল্যান্ডস্কেপ ছবির নীচে ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা: "প্রিয় ক্লাশাকে চিরকাল মনে রাখার দিনে, তারিখ ১৮.৩.৪০" এই লেখাটি ছাড়া ক্লাভদিয়াকে মনে পড়াবার মতো আর কিছুই নেই এখানে। সুতোটা পর্যন্ত সব কিছুই গুটিয়ে বাটিয়ে নিয়ে গেছে সে, শুধু বোঝা যায় এই ল্যান্ডস্কেপটা, তার উদ্দেশে নিবেদন করা এই ছবিটা সে রাখবে কোথায়...

নাতালিয়া টেবিলের বাতি জ্বালিয়ে চিঠি লিখতে বসে স্বামী আর ভাই পাভেলকে। ক্লাভদিয়া চলে যাবার পর থেকে ও পাভেলকে চিঠি লেখে প্রতি শনিবারে। তাতে একটি কথাও থাকে না ক্লাভদিয়া সম্পর্কে, একটি কথা নয় ক্লান্তির, কষ্টের। লেখে ছেলেমেয়েদের কথা, বাপ মায়ের কথা, কাজকর্মের কথা, লেখে অচিরেই শেষ হবে যুদ্ধ, বিরহ, দুঃখ...

রবিবারের সকালে ইভদোকিয়া যায় বাজারে। গিজগিজ করে লোক, বিক্রি হয় কৌটো করে সেদ্ধ শুয়োর-মাংস আর

সসেজ, দুধওয়ালী আর মিঠাইওয়ালীরা খরিদ্দারদের ডাকাডাকি করে, গাইয়েরা গান ধরে বিজয়ের, মেয়েদের সতীত্ব আর পুরুষদের বীরত্বের, গণৎকাররা বলে ভবিষ্যতের কথা। তাস দিয়েই হোক, আর বরবটি দিয়েই হোক, আর গুহ্যগ্রন্থ দিয়েই হোক, ভাগ্য গণনা করে নিতে ইভদোকিয়ার আপত্তি নেই, কিন্তু ওর বিবেকে লাগে: চেনা-পরিচিত কারো হয়ত চোখে পড়বে, ভাববে: "দ্যাখো, ইভদোকিম নিকলাইচের বৌ, নাতালিয়ার মাতাটার একেবারে শিক্ষাদীক্ষা নেই, অন্ধকারে পড়ে আছে।" শুনে ইভদোকিম আর নাতালিয়ার খারাপ লাগবে। গণৎকারদের চারপাশে ভিড় করা মেয়েদের পাশ দিয়ে ঘুরে যায় ইভদোকিয়া: হয়ত বা এই মেয়েগুলোর মধ্যেই কেউ চেনে তাকে। তাদেরও অস্বস্তি লাগবে যদি সে তাদের ভাগ্য গণাতে দেখে ফেলে।

বাড়ি ফেরে ইভদোকিয়া। চুল্লি ধরে ওঠে, পাঁচজনে প্রাতরাশে বসে ওরা—ইভদোকিম আর ইভদোকিয়া, নাতালিয়া আর তার ছেলেমেয়ে দুটি। রবিবারের বড়ো টেবিল যেমন গিজগিজ করার কথা তেমন নয়, চের্নিশোভদের বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা। কিন্তু বরফের মতো ধবধবে পর্দা, সমারোহে ফুটে আছে কাতিয়ার ফুলগুলো, সবকিছুই টিপটাপ — যেন বাড়ির নবীন কর্তা গিন্নি যেন এইমাত্র কোথায় উঠে গেল, শিগগিরই ফিরবে। পরিষ্কার জামা পরে ইভদোকিম বসে বিশ্রাম নেয় তার কায়েমী জায়গাটিতে। ঠিক আগের মতোই ভারিক্কী চালে ইভদোকিয়া ছোটাছুটি করে চুল্লি থেকে টেবিলে। অল্প একটু বলি-কুঞ্চিত তার স্বচ্ছ চোখে

ঠিক আগের মতোই একটু সেই ধূর্ত ধূর্ত চাউনি, ভরাট ঠোঁটে একটু সেই হাসিহাসি ভাব, কিন্তু একটা নতুন আভা পড়েছে সে হাসিতে সে চাউনিতে — মাতৃস্নেহ ও মাতৃতিতিক্ষার আভা। নাতাশা বসে সোজা হয়ে, সুন্দরী সে, টান করে বাঁধা চুলে প্রথম পাক ধরেছে, নজর রাখে ছেলেমেয়ে দুটির ওপর — চেয়ারে যেন বাবু হয়ে বসে, লাফালাফি না করে, চামচে যেন ঠিক ভাবে ধরে।

ইভদোকিয়া বলে, 'তুই যে ছেলেমেয়েগুলোকে একেবারে সেপাই করার তালিম দিচ্ছিস! এখনই তো ওদের যা একটু হাত-পা ছড়াবার সময়।'

নাতালিয়া বলে, 'ওরা তো সৈন্যই। সবাই আমরা এখন সৈন্য।'

ভোলদিয়া চেয়ারের নিচে পায়ে পা ঠুকে মুখখানা ভারিক্কি করে তোলে।

'আর তোর মনে আছে দুনিয়া,' জিজ্ঞেস করে ইভদোকিম, 'কাতিয়ার শেষ চিঠিটা কবেকার, ষোলো তারিখের না সতেরো তারিখের ?'

ইভদোকিম জানে চিঠিটা ষোলো তারিখের। তবু বৌয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে এই জন্য যে এই উপলক্ষে চিঠিটা কৌটো থেকে বার করে দশম বারের মতো তা পড়া যাবে। আর অপলকে অনেক, অনেক দূরে যে সুদূর প্রান্তরে গেছে তার মেয়ে সেই দিকে চেয়ে পড়া শুনবে ইভদোকিয়া। আর সস্নেহে

বোনের কথা ভাববে কড়া স্বভাবের নাতালিয়া, আর শান্ত হয়ে এসে বাচ্চা ভোলাদিয়া জ্বলজ্বলে চোখে কল্পনা করতে থাকবে ট্যাঙ্ক, লড়াই, আর রহস্যময়ী তার মাসি কাতিয়াকে — কী সে করছে এখন?

'পিয়ন!' জানলার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে লেনা।

ইভদোকিয়া বলে ওঠে, 'ভগবান, ভগবান, ত্রাণ করো প্রভু!'

আর সবাই ছোটে বারান্দার দিকে।

মেয়ে-পিয়নটি মাথায় খাটো, মোটাসোটা, মুখে বসন্তের দাগ। ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করে বার করে দুটি চিঠি।

ইভদোকিম বলে, 'কাতিয়া আর নিকলাইয়ের চিঠি।'

'বাবা আর কাতিয়া মাসির চিঠি!' ভয় ভয় খুশিতে চ্যাঁচায় ভোলাদিয়া আর লেনা।

পিয়ন-মেয়েটিকে ইভদোকিয়া ডাকে, 'আয়, ভেতরে আয়, গরম কিছু একটু খেয়ে যা, একেবারে ভিজে গেছিস যে।'

'তার সময় নেই গো,' জবাব দেয় পিয়ন-মেয়েটি।

এগিয়ে যায় সে, পা ফেলে তাড়াতাড়ি, ধ্যাবড়া মতো একজোড়া পুরুষালি জুতো তার পায়ে, দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঝড় হোক বাদল হোক, কিরভ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যায় সে পিয়ন-মেয়ে, ঝুলি তার ফ্রণ্টের চিঠিতে বোঝাই, ভাগ্যের মতো এসে সে টোকা দেয় জানলায়।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ВЕРА ПАНОВА

ЕВДОКИЯ